দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান অবস্থা — পৃঃ ১১

৭২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯।। ২২ ভাদ্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



চায়ের চমকে কী দিদির কপাল চমকাবে?

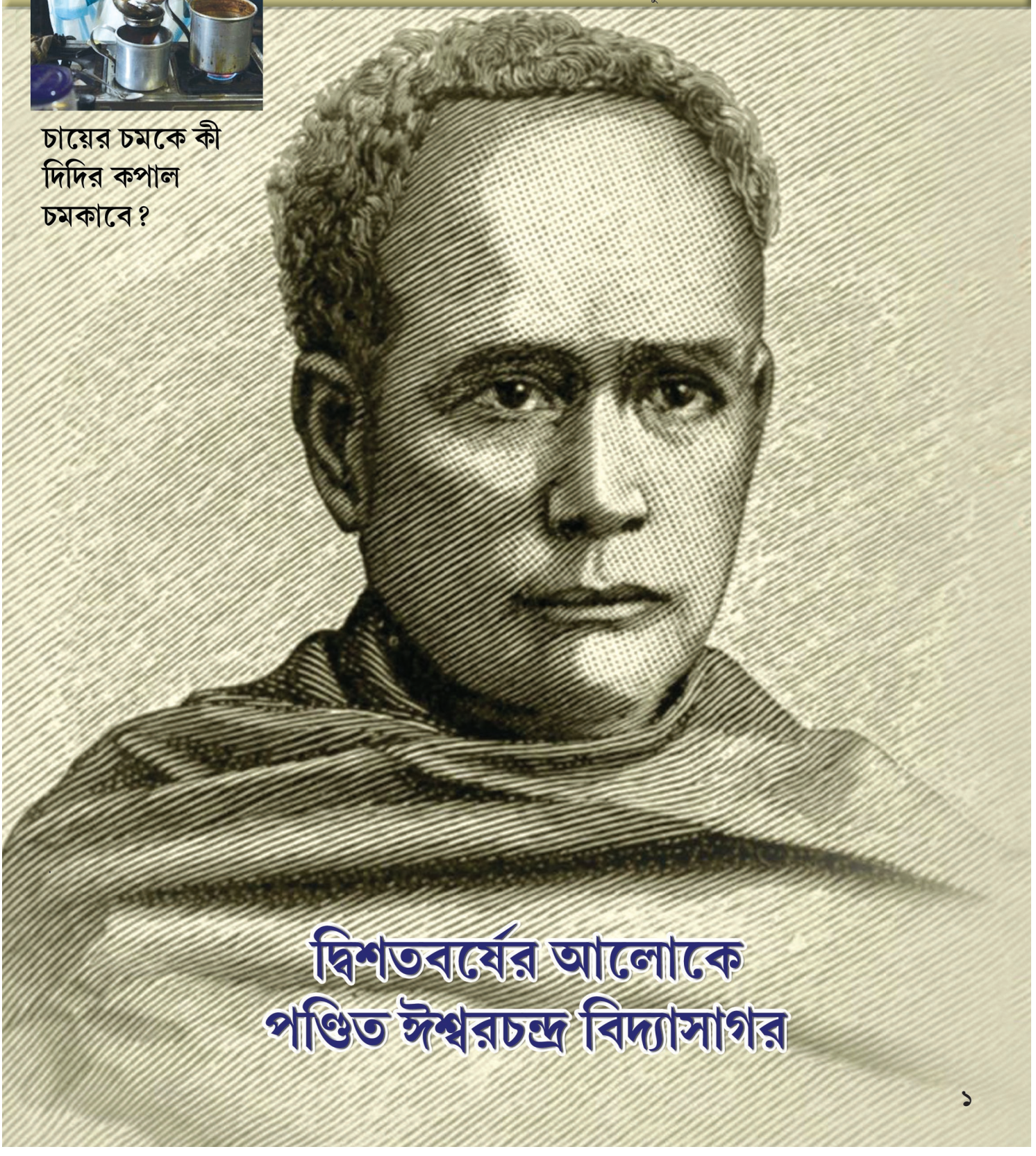

## দ্বিশতবর্ষের আলোকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২২ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৯ সেপ্টেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com


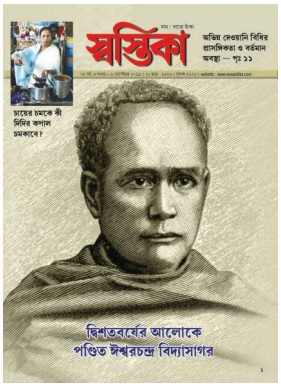



**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।




# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**রোমিলার বায়োডাটা চাওয়া দেশদ্রোহী চিহ্নিতকরণের পদক্ষেপ মাত্র** ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

**ডিম নয়, থিম চাই— পদ্ম নয়, ঘাসফুল চাই** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

**কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন জরুরি** ▯ চেতন ভগত ▯ ৮

**অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান অবস্থা** ▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১১

**পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য মানবশরীর হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন** ▯ ড. বিপ্লব রায় ▯ ১৩

**ভাষা, ধর্ম ও ভূখণ্ডের প্রেক্ষাপটে আজকের বাঙ্গালি** ▯ নারায়ণশঙ্কর দাস ▯ ১৫

**নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নীরব অবলুপ্তি** ▯ কৃষ্ণপ্রসাদ বিশ্বাস ▯ ১৭

**বাংলাদেশি ক্রিমিনালদের দিয়ে কোচবিহারে তৃণমূল হার্মাদরাজ** ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৩

**প্রশান্ত কিশোরের 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি ডাহা ফেল, এবার নয়া স্লোগান হোক 'হরি বলো, সঙ্গে চলো'** ▯ সুজিত রায় ▯ ২৪

**নিজেকে বাঁচাতে দলের কর্মীদের বলির পাঁঠা করছেন মমতা** ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৬

**নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে** ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

**বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালী মাতার পুজো** ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

**দ্বিশতবর্ষের আলোকে দয়ারসাগর** ▯ ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী ▯ ৩৫

**জল সংকটে সারা বিশ্বের জল সংকট** ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪২

**জনসমর্থন পুনরুদ্ধারে তৃণমূলের সাম্প্রতিক উদ্যোগ— সাফল্য আদৌ মিলবে কি?** ▯ বিমলশঙ্কর নন্দ ▯ ৪৩

**নিয়মিত বিভাগ**

**উবাচ : ১০** ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১**▯ **স্মরণে : ৪৫** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯**

প্রকাশিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## রক্তাক্ত দাড়িভিট : ফিরে দেখা

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। বাংলা ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদ করেছিল দাড়িভিট হাইস্কুলের ছাত্ররা। তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চিরকালের মতো থামিয়ে দিতে গুলি চালায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। মৃত্যু হয় দুই ছাত্রের। যে পশ্চিমবঙ্গকে ছাত্র-রাজনীতির পীঠস্থান হিসেবে দেখানো হয়, সেখানেই পুলিশের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু— আতঙ্কিত সকলেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— রক্তাক্ত দাড়িভিট : ফিরে দেখা। দাড়িভিটের ঘটনা নিয়ে থাকবে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। একেবারে সাম্প্রতিক আপডেট-সহ। লিখবেন অচিন্ত্য বিশ্বাস, মোহিত রায় প্রমুখ।

**দাম : বারো টাকা মাত্র**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
**AXIS Bank - Kolkata**
Branch : **Shakespeare Sarani**


সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা




SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

# সম্পাদকীয়

## ছলনাময়ী

ডুবন্ত তরীটিকে বাঁচাইবার প্রয়াসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম প্রয়াস 'দিদিকে বলো।' প্রয়াস না বলিয়া ইহাকে সস্তা এবং চটুল চমক বলাই শ্রেয়। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে এই ধরনের সস্তা এবং চটুল চমক তিনি ইতিপূর্বে বহুবার দিয়াছেন। তাহাতে সাময়িকভাবে তাঁহার রাজনৈতিক লাভ হইলেও পরবর্তীকালে মানুষ বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ওইগুলি ছিল নিছক লোক ঠকাইবার কল। তবে এইবার 'দিদিকে বলো' বলিয়া হাঁক পাড়িয়া আসরে নামিলেও লাভ যে বিশেষ হইবে না, তা বোধকরি স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার এই সাত বৎসরের শাসনকালেই এই রাজ্যের মানুষ বুঝিয়াছেন দুর্নীতি, অপদার্থতা এবং স্বৈরাচার ব্যতিরেকে রাজ্যের মানুষকে তৃণমূল নেত্রীর অন্য কিছুই দিবার নাই। বুঝিয়াছেন বলিয়াই বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী কার্যত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। তৃণমূল নেত্রী ভাবিয়াছিলেন, ধমকাইয়া চমকাইয়া তিনি রাজ্যের মানুষকে তাঁবে রাখিবেন। কিন্তু, বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর বুঝিতে পারিতেছেন, এই রাজ্যের মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা আর তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে থাকিতে চাহে না। অতএব, অশনি সংকেত পাইয়াছেন তৃণমূল নেত্রী। এই সংকট হইতে কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে নির্বাচনী কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোরের দ্বারস্থ হইয়াছেন তিনি।

এই 'দিদিকে বলো' চমকের পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তাহাও অবশ্য ক্রমশ পরিষ্কার হইতেছে। কিছুদিন পূর্বেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানি ফিরত দিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন সভায় সভায়। তাহার পরিণতিতে জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়িতে হইয়াছে। এই নেতা-নেত্রীরা কেহই ধোয়া তুলসীপত্র নহে। কিন্তু প্রশ্নটা অন্যত্র। জনগণের বিক্ষোভের মুখে এই নেতা-নেত্রীদের ঠেলিয়া দিয়া রাঘব বোয়ালদের আড়াল করিতেছেন না তো তিনি? তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতা-মন্ত্রীরা নানাবিধ দুর্নীতিতে জড়িত—তাহাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ কেন করিতেছেন না তৃণমূল নেত্রী। তদুপরি, তিনি এমনভাব করিতেছেন, যেন মনে হয়, দলটিতে তাঁহাকে এবং তাঁহার পেয়ারের কয়েকজনকে বাদ দিলে সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। যে নেত্রী দলের কর্মীদের বলির পাঁঠা করিয়া নিজে পিঠ বাঁচাইতে চাহেন, তাহার উপর দলের কর্মীরা আর ভরসা রাখিবেন কেন?

এই সস্তা চটুল চমকের রাজনীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করিয়াছিলেন বহু পূর্বেই। নিজেকে 'সততার প্রতীক' হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এক সময়। পরবর্তীকালে সবাই বুঝিয়াছে, তিনি প্রকৃত সৎ হইতে পারেন নাই। সৎ হইবার ভান করিয়া রাজনৈতিক ফায়দা লুটিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটি অলীক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া ডিগ্রি নামের পূর্বে লাগাইয়া বিদগ্ধ সাজিবার মিথ্যা প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার এইসব চমকের ফানুস চুপসিয়া যাইতে অবশ্য বেশিদিন লাগে নাই। এক হতভাগিনী মূক বধির ধর্ষিতা কিশোরী ফেলানি বসাককে সঙ্গে লইয়া মহাকরণে ধর্নায় বসিয়া রাজনৈতিক প্রচার আদায় করিয়াছেন। অথচ পরবর্তীকালে ওই হতভাগিনী মূক বধির কিশোরীটির দিকে আর ফিরিয়া তাকান নাই। 'দিদিকে বলো'-ও তাঁহার এইরকমই একটি লোককে বোকা বানাইবার প্রয়াস—তাহা আর না বলিয়া দিলেও চলিবে।

চালাকির দ্বারা যে কোনো মহৎকার্য সিদ্ধ হয় না—তাহা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর স্মরণে রাখা ভালো। কিছু মানুষকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু চিরদিনের জন্য যায় না। রাজ্যের মানুষকে যদি বোকা ভাবিয়া থাকেন তৃণমূল নেত্রী, তাহা হইলে তিনি মস্ত ভুল করিতেছেন। রাজ্যের মানুষ তাহার প্রকৃত চরিত্রটি ধরিয়া ফেলিয়াছে। ছলনায় তাহারা আর ভুলিবে না। ২০২১-এ বিদায় লইতেই হইবে ছলনাময়ীকে!

## সুভাষিতম্

*যৌবনং ধর্মসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।*
*একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।।*

*যৌবন, ধনসম্পত্তি, ক্ষমতা ও অবিবেকিতা—এর মধ্যে একটিই অনর্থের জন্য যথেষ্ট। চারটি একসঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই!*

# রোমিলার বায়োডেটা চাওয়া দেশদ্রোহী চিহ্নিতকরণের পদক্ষেপ মাত্র

দেশের শিক্ষামহলে এখন গেল গেল রব উঠেছে। কারণ দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মহা-অপরাধ, তাঁরা এমেরিটাস অধ্যাপক রোমিলা থাপারের বায়োডেটা জমা দিতে বলেছেন। অবশ্য শুধু রোমিলা নয়, সঙ্গে আরও এগারোজন অধ্যাপকেরও বায়োডেটা চাওয়া হয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, রোমিলা থাপারের মতো এমেরিটাস অধ্যাপক, যারা অবসরকালীন সময়েও অধ্যাপকবৃত্তির যাবতীয় সুযোগ পান আর গত পাঁচ বছরে ঠিক কী কাজ করেছেন, সেই তথ্য হাতে রাখতেই যাবে পরিভাষায় 'ডেটাবেস' বলা হয় জে এন ইউ কর্তৃপক্ষ এমন পদক্ষেপ করছেন, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু সুকৌশলে 'বিশ্ববন্দিত' রোমিলা থাপারের যোগ্যতা যাচাই করতে চাইছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক— এই বার্তা রটানো হচ্ছে। এদিকে আবার রোমিলা জানিয়েছেন জে এন ইউ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের ক্যারিকুলাম ভিটা বা সিভি জমা দিতে তিনি নারাজ।

সামান্য বিষয়ে এত গোল কেন? এতে কি রোমিলাদেবীর সম্মানে আঘাত লাগছে? এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যদি তাঁর সম্মানে আঘাত লাগে তবে প্রশ্ন ওঠে তা কি এতই ঠুনকো। আসলে আঘাতটা সম্মানে নয়, আঁতে ঘা লেগেছে। রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, বিপান চন্দ্রদের 'ইতিহাসবিদ' কিংবা অমর্ত্য সেনের 'অর্থনতিবিদ' পরিচয়ের আড়ালে আরও একটা সত্য থেকে থাকে, সেটা হলো এরা অতি বাম রাজনীতির ফসলমাত্র, যে রাজনীতি ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্য মূল প্রতিবন্ধকতার কাজ করছে। আর সেই কাজে রোমিলা থাপারের মতো ভারত-বিদ্বেষীরা তাদের ভূমিকা পালন করে। ফলে রোমিলার 'এমেরিটাস অধ্যাপক'-এর মতো সম্মাননীয় পদ বাতিল হতে পারে এমন হাওয়ায় বাজার গরমের চেষ্টা হচ্ছে। কারণ এদের 'ইতিহাসবিদ' মুখোশটা খুলে গেলে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা মুখটি বাদে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা বামপন্থীদের

**বিশ্বামিত্র-র কলম**

দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের চূড়ান্ত হেনস্থা করা হয়েছিল, কারণ তাঁরা বামপন্থী ছিলেন না। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিয়েছিল, যারা দেশটাকে ব্রিটিশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল স্বাধীনতার পর তারাই হঠাৎ সাধু বনে গেল এবং এই সাধুতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য 'ইতিহাস'টা বদলানো খুব জরুরি ছিল। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসই নয়, ভারতের প্রাচীন গৌরব ভুলিয়ে দিয়ে তাকে ক্ষীণ করে দেখাতে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বোনা শুরু হলো। এই চক্রান্তের মূল পাণ্ডা জওহরলাল নেহরু। 'নেহরুর ভারত' বলে বর্তমানে যে কথাটির খুব চল তা আদতে বামপন্থী 'ঐতিহাসিক'দের সৃষ্ট একটা জঘন্য ভারতবর্ষের ছবি।

এর কারণটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। প্রাচীন গান্ধার রাজা বা আজকের আফগানিস্তান, কিংবা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি ভারতের অখণ্ড অংশগুলি আস্তে আস্তে ইসলামের গ্রামে গিয়েছি। বাকি অবশিষ্ট ভারতকে ইসলামের গ্রামে নিয়ে যেতে পারলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়। জিন্নার সঙ্গে নেহরু রাজ্যপাট ভাগাভাগি করে নিয়ে বুঝেছিলেন ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলে তাঁর জমিদারি বেশিদিন টিকবে না। তাই প্রথমেই দরকার ইতিহাস ভুলিয়ে দাও। সেই পথে প্রতিবন্ধক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সরিয়ে দাও আর ষড়যন্ত্রী 'ঐতিহাসিক' তৈরি করে ফেল। নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় সেই দায়িত্ব পালন করে চলছে। নেহরু কন্যা ইন্দিরা তাঁর বাবার মান রাখতে সংবিধানে প্রবেশ করিয়েছিলেন 'সেকুলার' শব্দটি।

সাতষট্টি বছর ধরে এই খেলা চলেছে। যখন যে সরকার আসুক, এমনকি বাজপেয়ী সরকারের আমলেও দেশদ্রোহিতার সূতিকাগার জেএনইউ তার কর্তব্য পালন করেছে। গোল বাঁধল মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর। নেহরুর ভারত মুক্তির সন্ধান পেল মোদীর ভারতে। নেহরু-মোদী রূপক শব্দ মাত্র। আসলে জঘন্য, হীন ভারত থেকে গৌরবময় ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান এই উত্তরণের আঁচ তো এতকাল মৌরসিপাট্টা চালানো জেএনইউ-তে পড়বেই। আর তার তাপেই এমন রোমিলারা পুড়ছেন, সুতরাং দেশদ্রোহীদের একটু জ্বলুনি তো হবেই।

হিন্দুরা অসভ্য, গোরুখেকো, আরও যা যা থিয়োরি আছে রোমিলা থাপারদের অত্যুৎসাহে তা প্রমাণের চেষ্টায় আপনি সহজেই বুঝবেন সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের ধর্ম এটা হতে পারে না, ইসলামিক ভারত গঠনের মনোবাসনাই এই ধরনের বিকৃত ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। যাঁর একমাত্র কাজ দেশের বিরোধিতা করা, আর হিন্দুদের গালাগালি দেওয়া এবং ইসলামিক মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক জিগির তোলা, তিনি ভারতীয়দের করের টাকায় এমরিটাস অধ্যাপকের স্বীকৃতি নিয়ে ভারতের খেয়ে-পরে তাদেরই দাড়ি ওপড়ানোর আর কী কী ব্যবস্থা করেছেন, দেশের মানুষের তা জানবে অবশ্যই অধিকার আছে। রোমিলার বায়োডেটা তলব দেশদ্রোহী চিহ্নিতকরণের অবশ্যই প্রথম ধাপ। ■

# ডিম নয়, থিম চাই
# পদ্ম নয়, ঘাসফুল চাই

প্রিয় বঙ্গবাসী,

সামনে পুজো। সুতরাং মায়ের আরাধনা করুন। অন্য দাবি দাওয়া ভুলে যান। এখন শুধু উৎসবে মেতে ওঠার দিন। কোনও অভাব অভিযোগ একদম নয়। মিড ডে মিলে ডিম, সরকারি মাইনেতে বকেয়া ডিএ এসব ভুলে পুজোয় মাতুন। নতুন জামাকাপড় না হলেও চলবে, কিন্তু পুজোয় মাততে হবে। হবেই। আমাদের গরিবের সরকার আর কিছু না পারুক আপনাদের জন্য উৎসব চালু রেখেছেন। তাতে তো কোনও কার্পণ্য করেনি। সুতরাং, নো দাবিদাওয়া।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময়েই নিজেকে 'গরিব সরকার'-এর মুখ্যমন্ত্রী বলে দাবি করেন। ডিএ বৃদ্ধি থেকে বেতন কমিশনের দাবি, সব প্রসঙ্গেই এই একই ভাবে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন তিনি। সম্প্রতি মিড ডে মিল-এ ডিম না খাওয়ানোর যুক্তি হিসেবেও সরকারি তহবিলের 'অত টাকা নেই' বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজো অনুদান ঘোষণাতেও তার অন্যথা হয়নি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের শারদীয় উৎসবের বৈঠকে নিজের বক্তব্যের শুরুতেই রাজ্য সরকারকে 'গরিব সরকার' বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই বক্তৃতার মধ্যেই ঘোষণা, এবার পুজোয় পুজো কমিটিগুলিকে কমপক্ষে ৭০ কোটি টাকা দেবে রাজ্য। ভাবুন কতটা উদার আমাদের দিদি। গর্ব অনুভব করুন।

পুজো কমিটিকে টাকা দেওয়া নতুন নয়। গত বছরেও রাজ্যের ২৮ হাজার পুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। এবার সেটাই বেড়ে ২৫ হাজার টাকা হচ্ছে। ভাবুন একবার ভাবুন। কে করে এতটা!

এর উপরে আবার যে সব পুজো কমিটির পরিচালনার দায়িত্ব মহিলাদের উপরে সেখানে ২৫-এর জায়গায় ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তবে মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির সংখ্যা আমার জানা নেই। সকলকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার হিসেবেই ২৮ হাজার পুজোর জন্য খরচ হবে ৭০ কোটি টাকা।

এখানেই শেষ নয়। পুজোর কার্নিভালোর জন্যও সরকারি খরচ রয়েছে। অন্য দিকে, পুজোর সময়ে সরকারি আয়ও এবার কমবে। তার পিছনেও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মহানুভব ঘোষণা। দিদি জানিয়েছেন, সব পুজো কমিটি বিদ্যুতের খরচে ২৫ শতাংশ ছাড় পাবে। দমকল বিভাগকে অনুমতির জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। একই সঙ্গে রাজ্যের পুরসভাগুলিও পুজো কমিটির বিজ্ঞাপন থেকে আয় করতে পারবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধীরা ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছেন। তাদের প্রশ্ন, অর্থাভাবে সরকার যখন রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দিতে পারে না, অন্যান্য রাজ্য তথা কেন্দ্রের হারে বেতন দিতে পারে না, সেখানে এত টাকা কী করে উৎসবের জন্য খরচ করা যায়?

সেই বিরোধীদের বলছি, দিদির অত দোষ ধরবেন না। অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করুন বরং উল্টো দিক থেকে। ভাবুন তো অন্য কোনো গরিব রাজ্য এমন ভাবে পুজোর জন্য খরচ করে। নিজের আয় কমিয়ে দেয়! পড়ুয়াদের ডিম অনেকেই খাওয়ায়। কিন্তু কে পুজোর থিম নিয়ে এত মহানুভবতা দেখায়! অনেকেই শিল্প নিয়ে আসে, কিন্তু কে এমন উৎসব, মোচ্ছবকে শিল্পের তকমা দেয়! দিতে পারে! ভাবুন। ভাবতে শিখুন। ভেবে গর্বিত হোন।

—**সুন্দর মৌলিক**

# কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন জরুরি

অতিথি কলম



চেতন ভগত

কাশ্মীরে দীর্ঘ বিতর্কিত ৩৭০ ধারা বিলোপের খবরে সারা ভারত খুশি হয়েছে, সবরকম ভাবে এই ঘটনাকে সাদরে মেনে নিয়েছে। কাশ্মীর কিন্তু এখনও নানাবিধ বাধা নিষেধের মধ্যে নাগরিক জীবনযাপন করছে। সেখানে কারফিউ অনেক জায়গায় বলবৎ রয়েছে। আমি যখন বড়ো হয়ে উঠছিলাম তখন এখনকার প্রযুক্তি চালু ছিল না। কিন্তু আজ আমি এগুলি ছাড়া বেঁচে থাকার কথা ভাবতে ঘৃণা বোধ করি। ইন্টারনেটে টিকিট কাটতে পারব না, প্রয়োজনে e-mail করা যাবে না তা সে বন্ধু হোক বা আত্মীয় বা কোনো জরুরি কাজ কোনোটাই নয়। ব্যবসা থাকলে গ্রাহক বা অন্যান্য সহযোগীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা তো আজকের দিনে জীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। জীবন যাপনের গুণগত মানও নেমে যাবে।

যদিও এটা ঠিক অতীতে কাশ্মীরে প্রায়শই ইন্টারনেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পাতিদার আন্দোলনের সময়, গুজরাটে গুজ্জর বিক্ষোভের সময় রাজস্থানে উত্তেজনা বাড়তে না দেওয়ার কারণে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি সবই ছিল অত্যন্ত সাময়িক, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাশ্মীরে কিন্তু তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত আন্তর্জালহীন। এই অবস্থা নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক। যদিও এই অবস্থা কবে স্বাভাবিক করা হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর মতামতের ওপর, তবু আমরা চাইব অতি দ্রুত নিষেধাজ্ঞাগুলি উঠে যাক।



**যতই না না বলে চিৎকার করুক না কেন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গি হয়ে যাবে। কাশ্মীরি ও বাকি ভারতীয়দের মধ্যে বহুবিধ সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। বহু দশক ধরেই ভারতীয় পর্যটকের প্রিয় ভ্রমণকেন্দ্র কাশ্মীর। ভারত বরাবরই একটি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মিলনভূমি— কাশ্মীরিরাও অচিরেই তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মূলস্রোতে মিশে যাবে।**

এত কথা বলার পর কিন্তু এটাও বলা দরকার কিছু ভারত-বিরোধী পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাও গোটা পরিস্থিতির গতি প্রকৃতি না বুঝে কাশ্মীরে সরকার পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে বলে রব তুলে দিতে চাইছেন। ভারত সরকারের হাতে এছাড়া কি অন্য কোনো বিকল্প খোলা ছিল? হ্যাঁ এ বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও সাম্প্রতিক অতীত ঘটনাবলীর দিকে নজর ফোরানো উচিত।

উপত্যকার একজন সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানি ২০১৬ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়। বুরহান বয়সে তরুণ, সুদর্শন, বলিয়ে কইয়ে, সংবাদ মাধ্যমে সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব ছিল। ওয়ানি প্রায়শই তার অন্য সন্ত্রাসবাদী বন্ধুদের হাতে অত্যাধুনিক রাইফেল শোভিত হয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ছবি পাঠাতো। বন্ধুরাও সকলেই মেশিনগান নিয়েই ছবি আদান প্রদান করত। এর ফলে তার কিছু অনুরাগীও জুটেছিল। কিন্তু তার ফলে একটা জিনিস তো কোনোভাবেই বদলায়নি যে সে একজন সন্ত্রাসবাদী ছিল। তার হিংসার পথ নেওয়ার কোনো নিজস্ব যুক্তি নিশ্চয় থাকতে পারে কিন্তু তার সমর্থনে সে হিংসার পথ ধরেছিল। এই কারণেই মুখোমুখি সংঘর্ষে সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। যা বিশ্বের যে কোনো দেশের সন্ত্রাসবাদীরই অন্তিম পরিণতি। কিন্তু জনপ্রিয়তার টানে কাশ্মীর উপত্যকায় তার শোক মিছিলে দু' লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল।

গোটা অঞ্চল জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষে নামতে হয়। শতাধিক লোক মারা যায় ও ১৫ হাজার মানুষ আহত হয়। কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না থাকায় শয়ে শয়ে বুরহান সমর্থক একজোট হতে থাকে। তারা ভারত-বিরোধী স্লোগানের সঙ্গে অত্যন্ত আপত্তিকর, উত্তেজক মন্তব্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজারে ছড়িয়ে দেয়। সেসব দেখেশুনে বুরহান সমর্থকদের একটা অংশ নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। পাথরের আঘাতে বাহিনীর বহু জওয়ান মারাত্মক আহত হয়। পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

পরিণতিতে অবস্থা আয়ত্তে আনতে কারফিউ জারি করা হয়। কাশ্মীরে ইন্টারনেট পরিষেবা ৫০ দিনের জন্য বন্ধ থাকে (হ্যাঁ, ঠিক এখনকারই মতো আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল)। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েক মাস লেগেছিল। এই ঘটনা নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর টনক নড়িয়ে দেয়। যদি বিশেষ কোনো ঘটনার কারণে হিংসা শুরু হয় সেক্ষেত্রে তার মোকাবিলা করতে পর্যাপ্ত পূর্বপ্রস্তুতি রাখতেই হবে। ৩৭০ ধারা নাকচ হওয়ার পর বাহিনী ঠিক সেটাই করেছে। যার ফলে বুরহানের মৃত্যুর পর যে পর্যায়ে হিংসা ছড়িয়েছিল, প্রাণহানি হয়েছিল, এবারে তার কিছুই ঘটেনি।

তাহলে, যদি ধরা যায় যে নির্দিষ্ট ওই এলাকাটির দেখভাল বা হেফাজত আপনার দায়িত্বে রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কী করা ঠিক মনে করবেন? ইন্টারনেট কানেকশান খুলে দেওয়া নাকি আপনার চারপাশে নির্বিচারে মানুষ খুন হতে দেওয়া? নিশ্চয় এমন পরিস্থিতির কোনোটাই আপনি চাইবেন না। আমরাও আশা করব অনতিবিলম্বে ইন্টারনেট চালু হয়ে যাক। কিন্তু ইন্টারনেটের প্রত্যাবর্তনের থেকেও কাশ্মীরে স্বাভাবিকতা ফেরানো ভীষণ জরুরি। বাস্তবিক এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। যদি কোনো সন্ত্রাসবাদীর অন্তিমযাত্রায় দু' লক্ষ লোক সহযাত্রী হয় তাদের সকলকেই নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদী বলা যাবে না। তাহলে এখানে কী করা উচিত? খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। বেশি সংখ্যায় জড়ো হয়েছে বলেই তাদের সেন্টিমেন্ট অনুযায়ী হিংসাত্মক কাজকর্ম দেখে হাত গুটিয়ে রাখবেন, না প্রশ্রয় দেবেন? আগামী কয়েক বছর ধরে ভারত সরকারকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে। একদিকে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সক্রিয় হওয়ার লক্ষণরেখা তৈরি করা ও কাশ্মীরিদের মনে রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা। অন্যদিকে তরুণদের জন্য আকর্ষণীয় প্রকল্প চালু করে তাদের মূল স্রোতের শরিক করা। কিন্তু কাশ্মীরিদের বিশ্বাস অর্জন করতে গিয়ে কোনোভাবেই চিরকালীন কোনো তোষণবাদী নীতি গ্রহণ করার রাজনীতি চলবে না। বলা ভালো গোটা কাশ্মীরের জনসংখ্যা মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকাবাসীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ। ১৩০ কোটি লোকসংখ্যার দেশের পটভূমিতে এই সংখ্যাটি নিতান্তই নগণ্য। তাই যদি আমরা দেশের সম্পদের কিছুটা বাড়তি হলেও এই সমস্যার হাল করতে খরচ করি মনে হয় তা বিফলে যাবে না। আমার প্রস্তাব অনুযায়ী সরকার ৫টা বিষয়ে চেষ্টা করতে পারে।

(১) যে সমস্ত কাশ্মীরি তরুণ চাকরি করতে ইচ্ছুক তাদের চাকরির বন্দোবস্ত করা। সরকারের কলসেন্টারগুলিকে ওখানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ ও পর্যটকদের জন্য skiresort তৈরি করা। মনরেগায় যে ধরনের কাজ দেওয়া হয় তাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে লোক নিযুক্ত করা।

(২) সমস্ত সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সমব্যথীদের এ যাবৎ করা যাবতীয় অপরাধমূলক কাজ মাফ করে দিয়ে একেবারে আনকোরা অবস্থা থেকে শুরু করা। এই সূত্রে একটি নতুন তারিখ ঠিক করে তারপর থেকে পাথরবাজি, সন্ত্রাসবাদী লিফলেট ছড়ানো, অস্ত্র তুলে নেওয়া, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নাম লেখানোর মতো কাজ বেআইনি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তোমার অতীত ক্রিয়া-কলাপের জন্য তোমাকে দাগি করে দেওয়া হবে না কিন্তু তোমাকেও ভবিষ্যতে সঠিক পথে চলতে হবে।

(৩) আগামী কয়েক বছর ধরে যতদিন না তারা চাকরি পাচ্ছে তাদের মাঝে মাঝে একটি নির্দিষ্ট ভাতা দেওয়া। পকেটে টাকা থাকলে লোকে কম রাগবে। কিছুটা নিরাপত্তা (অর্থনৈতিক) বোধ করবে। তারা ভবিষ্যৎ জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে সচেষ্ট হবে। এর ফলে তাদের সন্ত্রাসবাদীদের পথ বেছে নিতে দ্বিধা আসবে।

(৪) সীমিত সময়ের জন্য কাশ্মীরিদের জন্য বহু ক্ষেত্রে কিছুটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। আমি কখনই জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ প্রথায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এর ফলে যদি তাদের মনে আশার সঞ্চার হয় যে ভারত তাদের কাছে টেনে নিতে উদগ্রীব সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় কাজ হতে পারে। তাদের মোট সংখ্যা যেহেতু কম এর ফলে সামগ্রিক ভারতের ওপর তেমন চাপ পড়বে না।

শেষ দুটো প্রস্তাব শুনলে তোষণের রাজনীতি মনে হতে পারে। কিন্তু জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সময় মানুষকে প্র্যাকটিকাল হতেই হয়। কাশ্মীরিরা ও একই সঙ্গে সরকার এতে উপকৃত হবে। কাশ্মীরে যদি শান্তি ফিরে আসে তাহলে প্রতিরক্ষা খাতে যে খরচ বাঁচবে তার তুলনায় এই খরচ তো কিছুই নয়। তাই যথার্থই এটি টান-টান পরিস্থিতি।

যারা যতই না না বলে চিৎকার করুক না কেন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গি হয়ে যাবে। কাশ্মীরি ও বাকি ভারতীয়দের মধ্যে বহুবিধ সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। বহু দশক ধরেই ভারতীয় পর্যটকের প্রিয় ভ্রমণকেন্দ্র কাশ্মীর। ভারত বরাবরই একটি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মিলনভূমি— কাশ্মীরিরাও অচিরেই তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মূলস্রোতে মিশে যাবে। ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে হবে তার অবস্থান। বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা পর্যটন প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই ওখানকার অর্থনীতি উন্নত হয়ে উঠবে। ইন্টারনেট খুলে দেওয়া তাই যেমন জরুরি, তেমনই কখনোও যেন আর ভবিষ্যতে বন্ধ করতে না হয় সেটাও দেখা জরুরি।

***(বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)***

# রম্যরচনা

## গুলতানি

দুই গুলবাজের গল্প চলছে।

এক গুলবাজ আর এক গুলবাজকে বলল— জানিস, আমার দাদুর এতবড়ো গোয়ালঘর ছিল তুই চিন্তাই করতে পারবি না।

দ্বিতীয় গুলবাজ— কত বড়ো গোয়ালঘর?

প্রথম গুলবাজ— আরে বললে বিশ্বাস করবি না। আমার দাদুর গোয়ালে একসঙ্গে দশহাজার গোরু আর পঁচিশ হাজার মোষ থাকত। গোয়ালের একদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সকালে হাঁটা শুরু করলে রাত হয়ে গেলেও অন্য দিকের দরজায় পৌঁছতে পারবি না।

দ্বিতীয় গুলবাজ— ওহ্, এ আর এমন কী? আমার দাদুর এমন একটা মই ছিল যা দেখলে অবাক হয়ে যেতি।

প্রথম গুলবাজ— কী রকম মই?

দ্বিতীয় গুলবাজ— সে মই বেয়ে সকালে যদি উঠতে শুরু করিস, তাহলে রাতেই চাঁদে পৌঁছে যাবি।

প্রথম গুলবাজ— ধুস, যত বাজে কথা। এত বড়ো মই রাখতো কোথায়?

দ্বিতীয় গুলবাজ— কেন, তোর দাদুর গোয়ালঘরে!




# উবাচ



"আমি খুবই চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গে শান্তির পরিবেশ প্রয়োজন। আইনের শাসন ও শান্তিতে বিশ্বাস রেখে, হিংসা ছেড়ে, উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা দরকার।"

**জগদীপ ধনকর**
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

***সম্প্রতি ভাটপাড়ায় রাজনৈতিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য***



"কাশ্মীরে ৩৭০ বাতিলে ভারতের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধীর নাম ব্যবহার করছে পাকিস্তান। কংগ্রেসের এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।"

**অমিত শাহ**
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

***৩৭০ধারা বাতিলে রাহুল গান্ধীর বিরোধিতা প্রসঙ্গে সিলভাসায় এক জনসভায়***



"এনআরসি-র অন্তিম সূচি নিয়ে বিদেশি মিডিয়া ভুল খবর ছড়াচ্ছে, যা একেবারে ভুল। তালিকা ছুটদের আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সরকার।"

**রবীশ কুমার**
কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র

***অসমে এনআরসি ছুটদের নিয়ে ভুল প্রচারের প্রেক্ষিতে***

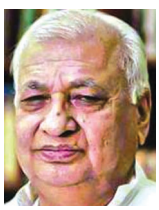

"রাজ্যপাল হিসেবে দেশসেবা করার এটা একটা ভালো সুযোগ। আমি সৌভাগ্যশালী ভারতের মতো দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, যেখানে বিবিধতার মধ্যে একতায় পূর্ণ। কেরলকে জানার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ আমার কাছে।"

**আরিফ মহম্মদ খান**
কেরলের রাজ্যপাল

***কেরলে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তির পর মন্তব্য***

# অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান অবস্থা

**সুদীপ নারায়ণ ঘোষ**

আমাদের দেশে নাগরিকদের জন্য ব্যক্তিগত আইনে—বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ও দত্তকগ্রহণ ইত্যাদি চলে বড় বড় ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব শাস্ত্র ও প্রথানুসারে। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে অভিন্ন আইন বা বিধি চালু করার কথা সংবিধানের নির্দেশিকা নীতির ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে—সংক্ষেপে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলতে তাই বোঝায়। আবার অনুচ্ছেদ ২৫-এ ভারতবর্ষে নিজস্ব ধর্মপালনের মৌলিক অধিকার আছে। এই দুটো একে অপরের বিরুদ্ধে যাবে না।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিতর্ক ঔপনিবেশিক ভারতেই শুরু হয়েছিল। তার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার সংস্কার সাধন করতে শুরু করেছিল। ১৮২৯ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল থাকার সময়ে সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন ঘোষণা করেন। কিন্তু তারা ধর্মীয় ব্যাপারে বেশিদূর হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বিশেষত ১৮৫৭-র মহা বিদ্রোহের পরে ১৮৫৯ রানির সনদে ধর্মীয় বিষয়ে একেবারে হস্তক্ষেপ না করার কথা ঘোষণা করা হয়। কেবল অপরাধ, ভূসম্পত্তি, চুক্তি আইন ও সাক্ষ্যপ্রমাণ এইগুলো সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।

শরিয়ত-নির্ভর মুসলিম পার্সোনাল ল' মুসলমান মহিলাদের বিপক্ষে ছিল বিশেষত বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার ও পণনির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে। মুসলমান এলিট সমাজের চাপে ১৯৩৭-এর শরিয়ত আইন পাশ হয় যাতে বলা হয়েছিল বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, দত্তকগ্রহণ, উত্তরাধিকার এসব ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরা শরিয়তি আইন মেনে চলবে।

নারীর স্বাধীনতা, সম্পত্তি, বিধবা অবস্থায় বিবাহ করা ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ধর্মে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছিল। বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রয়াসে ব্রিটিশ শাসক বিধবাবিবাহ আইন পাশ করে ১৮৫৬ সালে। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৮৬৫-তে পাশ হয়েছিল, তা মহিলাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা বিধানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হয়। সবই হিন্দুদের জন্য। ইন্ডিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৮৬৪ খ্রিস্টান মহিলাদের বিবাহ বিষয়ে পদ্ধতি ও সংস্কার সুনিশ্চিত করেছিল। বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন, ১৯২৩ ও হিন্দু ইনহারিট্যান্স (রিমুভাল অব ডিসএবিলিটিজ) অ্যাক্ট, ১৯২৮ হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির উপর অধিকার কায়েম করেছিলো। ১৯৩৩ সালে নারী সংগঠনগুলো তৎকালীন ব্যক্তিগত আইন বদলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার দাবি জানায়। হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার আইন, ১৯৩৭ পাশ হয় তার থেকে বি এন রাউ কমিটি গঠন হয়; ওই কমিটি সিদ্ধান্তে আসে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

> **“আরিফ মহম্মদ খান বলেছেন, ‘‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ৪৪ নং অনুচ্ছেদের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা আছে। যেহেতু এটা সুবিচারসম্মত ও নির্দেশিকা নীতির অংশ সেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষে এটা করা অবশ্য বাধ্যতামূলক। এজন্য যথাশীঘ্র মুসলমান নাগরিকরা কেন এগিয়ে আসবেন না তাঁদের ভুলগুলো শুধরে এক প্রগতিশীল উদার মানবিক সমাজ গড়তে?’ ”**

চালু করার সময় এসে গেছে। এই বিধি সমাজের আধুনিক প্রবণতা অনুসারে মহিলাদের সমানাধিকার দেবে তবে তার জোর ছিল শাস্ত্রানুসারে হিন্দু মহিলাদের অধিকার সুরক্ষার উপরে। রাউ কমিটি কয়েকবার তার রিপোর্ট দাখিল করে, শেষবার ১৯৪৭ সালে ভারতীয় সংসদে।

স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮—১৯৫১ ও ১৯৫১—১৯৫৪ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর সমর্থক ও মহিলা সদস্যদের নিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চেয়েছিলেন। আইনমন্ত্রী আম্বেদকর এই রাউ কমিটির বিল পেশ করার দায়িত্বে ছিলেন। দেখা গেল যে গোঁড়া হিন্দু আইনগুলো একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ একবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিধবাদের সম্পত্তির উপর অধিকার হিন্দু শাস্ত্রে আছে। আম্বেদকর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই হিন্দু বিলের আপত্তি করেছিলেন। কারণ তাঁরা দেখেছিলেন যে এই বিল ভীষণভাবে হিন্দু-বিরোধী ও ভারত-বিরোধী। তাঁরা বলেছিলেন যে সব ধর্মের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই। তাই এই বিল কাটছাঁট করে ১৯৫৬ সালে চারটে আইন জারি হয়, হিন্দু বিবাহ আইন, উত্তরাধিকার আইন, নাবালক ও অভিভাবকত্ব আইন এবং দত্তক ও খোরপোষ আইন। তখন ৪৪ অনুচ্ছেদ ঢোকানো হয় যাতে ভবিষ্যতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা যায়।

**সাম্প্রতিক অবস্থা**—ইন্দোরের এক মুসলমান মহিলা শাহ বানোর স্বামী মহম্মদ আহমে খান তাকে তিন তালাক দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়। ১৯৮৫ সালে শাহ বানো ফৌজদারি বিধির ১২৫ ধারায় ইন্দোরের নিম্ন আদালতে খোরপোষের জন্য মামলা দায়ের করেন। তার স্বামী খান বলেন শাহ বানো আর তার স্ত্রী নয় তাই সে ইসলামি

মতে যেটুকু পাওনা হয় তার অতিরিক্ত কোনো খোরপোষ দেবেন না আর সেসবের পরিমাণ হলো ৫৪০০ টাকা। শেষ পর্যন্ত মামলা শীর্ষ আদালত গ্রহণ করে। শীর্ষ আদালত কোনো ধর্মীয় নিয়মের উপর নির্ভর না করে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ ফৌজদারি বিধির উপর ভিত্তি ক'রে শাহবানের পক্ষে রায় দেয়।

এই মামলা কয়েকটি বিষয় সামনে আনে

মুসলমান মহিলাদের ও মুসলমান সমাজের অন্যান্য অংশের আকাঙ্ক্ষা ও প্রগতিশীল চরিত্র এতে বোঝা যায়।

মুসলমান মহিলাদের দুরবস্থা ও বিবাহের ব্যাপারে তাদের উপর যে পক্ষপাতদুষ্টতা কাজ করছে তা সকলের নজরে আনে।

সামাজিক ন্যায়নীতির জয় ঘোষিত হয়।

এটা ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনের দিকে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটা নারীর অধিকার ও সমতার পক্ষে বিতর্ক তুলে দেয়। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সুশীল সমাজ, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আইনসভাসমূহ ও সাধারণ মানুষ। আর একটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিতর্কের চেয়ে ভাল কিছু হয় না।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ শোরগোল তোলে এবং তার জেরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নতিস্বীকার ক'রে ১৯৮৬ সালে সংসেদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই রায় নাকচ করে বিল পাশ করান। যে তিন তালাকের বিরুদ্ধে এই খোরপোষ মামলা পরবর্তীকালে দেখা গেছে তা কোরাণ অনুসারী নয় অথচ তখন এইরকম দাবি করা হয়েছিল বৃহত্তর মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে। আর অনুচ্ছেদ ৪৪-এর অন্তর্নিহিত ধারণা হলো কোনো সভ্য সমাজে ধর্ম আর ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে কোনো বাধ্যতামূলক সম্পর্ক নেই। বিবাহ, উত্তরাধিকার ও অনুরূপ বিষয়গুলো ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির আর আইন দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এবিষয়ে বিচারপতি আর এম সহায়ের মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন---''আমাদের দেশ একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। সামান্যতম বিচ্যুতি এর সমাজবন্ধন শিথিল করতে পারে। কিন্তু যে ধর্মীয় অনুশীলন মানুষের অধিকার ও মর্যাদা লঙ্ঘন করে এবং ধর্মীয় নেতারা নাগরিক ও বৈষয়িক স্বাধীনতার শ্বাসরোধ করে সেটা কোনো স্বাধিকার নয়, সেটা নিপীড়ন। সুতরাং নিপীড়িতদের সুরক্ষা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি উভয় কারণে একটা অভিন্ন বিধি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।''

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শেষ পর্যন্ত সাম্য আনবে। এটা লিঙ্গ সাম্য আনতে সাহায্য করবে, জাতীয় সংহতি আনবে ও সংখ্যালঘুদের মূলস্রোতে নিয়ে আসবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে প্রোৎসাহন জোগাবে। এই বিধির অন্তর্নিহিত প্রেরণা বুঝতে মানুষের মধ্যে একটা প্রগতিবাদী, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এর জন্য চাই শিক্ষা, সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি যেন সব ধর্মের কল্যাণসাধন করে।

মুসলিম পার্সোনাল ল'তে একতরফা বিবাহবিচ্ছেদ (সম্প্রতি এটা রদ করে বিল পাশ হয়েছে) ও বহুবিবাহের অনুমতি আছে। সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কোনো প্রগতিপন্থীর পক্ষে। গোয়ায় কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু আছে। ২০১৫ সালে ভারতের শীর্ষ আদালত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। ভারতীয় ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবি তুফাইল আহমেদ ২০১৬ সালে ৩০শে নভেম্বর এর ১২ দফা খসড়া পেশ করে বলেছেন ১৯৫০ সাল থেকে সরকার কোনো চেষ্টা করেনি। ২০১৮-র ৩১শে আগস্ট আইন কমিশন ১৮৫ পাতার পত্রে মত দিয়েছে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এই পর্বে প্রয়োজনও নয় কাঙ্খিতও নয়, দেশের বহুস্বরকে অমান্য করা যায় না।

সম্প্রতি আরিফ মহম্মদ খান বলেছেন, ''অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ৪৪ নং অনুচ্ছেদের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা আছে। যেহেতু এটা সুবিচারসম্মত ও নির্দেশিকা নীতির অংশ সেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষে এটা করা অবশ্য বাধ্যতামূলক। এজন্য যথাশীঘ্র মুসলমান নাগরিকরা কেন এগিয়ে আসবেন না তাঁদের ভুলগুলো শুধরে এক প্রগতিশীল উদার মানবিক সমাজ গড়তে?' ▮


## একটি আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় গত ৭১ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তাবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকা-র পাতায় আপনি তা পাবেন। বাজার চলতি সংবাদপত্রে যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি থাকে না, অন্যান্য খবরের ভিড়ে আসল খবরটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকা-র বক্তব্যে তখন আপনি আপনার মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। স্বস্তিকা-র প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো কাগজ।

৭২ বর্ষে পদার্পণকে কেন্দ্র করে স্বস্তিকা ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করেছে। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক হোন— এই অনুরোধ। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিঃ দ্রঃ— ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর পূর্বে গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) স্বস্তিকার কার্যালয়ে জমা দিলেই পূজা সংখ্যা (২০১৯) পাওয়া যাবে।

**প্রচার প্রসার বিভাগ, স্বস্তিকা**

# পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য মানব শরীর হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

**ড. বিপ্লব পাল**

এই পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই এককোষী জীব হতে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা আজকের মানবে উত্তীর্ণ হয়েছি। মানুষের বিবর্তনের ধারা আজও অব্যাহত আর তা ঘটে চলেছে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে। মানবের এই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ফল হলো আধুনিকালের প্রযুক্তিগত উন্নতি। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে আজ বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের বিবর্তনের শুরুটা হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে খুবই সাধারণ সূত্রের উপর ভিত্তি করে। গত শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বেশিরভাগই ছিল মেকানিক্যাল মুভমেন্ট নির্ভর, আর তার ফলে এদের আকার অনেক বড় হতো। আর আকার অনেক বড় হওয়াতে এদের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা ছিল অনেক বেশি। যেমন প্রথম যুগের রেডিয়ো রিসিভার এত বড় হতো যে সহজে বহন করা যেত না। বর্তমানে তা এতই ছোট যে পকেটে বহন করা যায়। এরূপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অপরিবহণযোগ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে পরিবহণযোগ্য (Portable) প্রযুক্তিতে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে এই বিবর্তন এক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির রূপ নিয়েছে। আর তার ফলে পরিবহণযোগ্য যন্ত্রাদির কলেবর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম রূপ নিয়েছে, আর তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের শক্তির চাহিদাও ক্রমাগত কমেছে। পরিবহণযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির বেশিরভাগই এখন ব্যাটারি নির্ভর। কারণ ব্যাটারির উল্লেখযোগ্য কোনো সহজলভ্য বিকল্প আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজ আমরা যুগের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি যেখান হতে অদূর

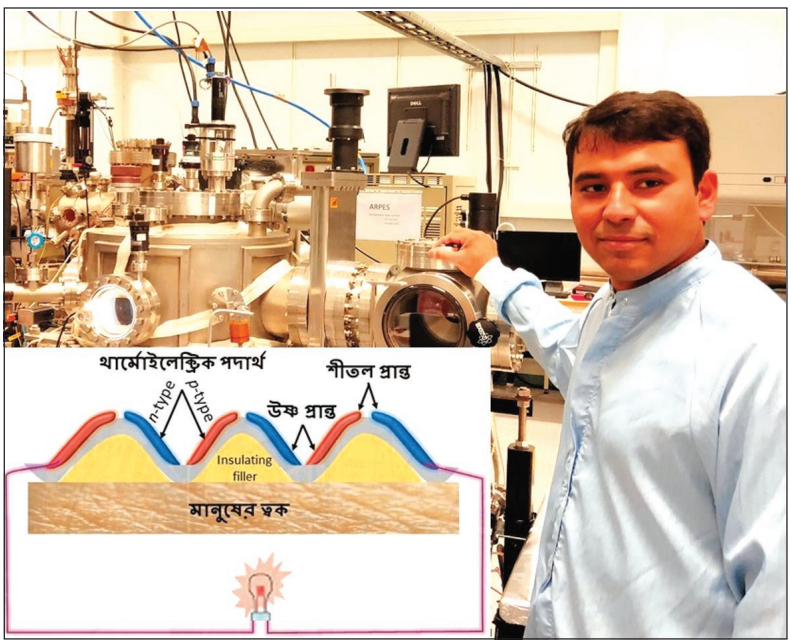


ভবিষ্যতে প্রযুক্তির বিবর্তন অন্যমাত্রা পেতে চলেছে। আমরা ক্রমাগত পরিবহণ-অযোগ্য প্রযুক্তি হতে পরিধানযোগ্য (Wearable) প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করতে চলেছি। সম্প্রতি এই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক ব্যবহারে, যেমন স্মার্ট টেক্সটাইল, হেলথ্‌কেয়ার নেভিগেশন সিস্টেম, অ্যাক্টিভিটি ট্রাকিং সিস্টেম, ইত্যাদিতে। বর্তমানে অনেক ইলেকট্রনিক মাইক্রোসিস্টেমের আকার এতই ছোট যে এদের শক্তির চাহিদা খুবই কম, মিলিওয়াট এমনকী মাইক্রোওয়াটের পরিধির মধ্যে। আর তার ফলে শক্তি সরবরাহকারী ব্যাটারির আকার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে হয়েছে। এতে রোগীর বিভিন্ন শারীরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য, যেমন হার্ট রেট (ECG ও HRV), ব্রেনওয়েভ (EEG), মাসল বায়োসিগন্যাল (EMG), ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি। এই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির প্রধান অন্তরায় হলো এদের শক্তি সরবরাহকারী পাওয়ার ডিভাইসের সীমাবদ্ধতা। বর্তমানে সমস্ত ধরনের পরিবহণযোগ্য ও পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি মূলত ব্যাটারি নির্ভর, আর ব্যাটারির মূল সমস্যা হলো এদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর চার্জের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ব্যাটারির পরিবেশগত প্রভাব যথেষ্ট ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু হলো পুনর্নবীকরণ বিকল্প শক্তির উদ্ভাবন করা। পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য শক্তির উৎস হতে পারে আমাদের শরীর থেকে উৎপন্ন তাপ। আমাদের শরীর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট হতে মেটাবলিজমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাপ উৎপন্ন করে চলেছে। মানব দেহে উৎপন্ন মোট তাপশক্তির পরিমাণ আনুমানিক ১০০ ওয়াট। এই তাপশক্তির কিছুটা অংশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির শক্তি-সমস্যার সমাধান হতে পারে। শরীরের তাপ হতে

বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হতে পারে থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজি। সুইডেনের লিংশপিং ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বর্তমান গবেষণা ঠিক এই পরিধানযোগ্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির উপর। আমাদের নিরন্তর গবেষণার ফলে এক নমনীয় থার্মোইলেকট্রিক সিরামিক পদার্থের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। আমাদের এই উদ্ভাবন সম্প্রতি ইউরোপিয়ান থার্মোইলেকট্রিক সোসাইটি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।

থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস যে কোনো উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল থেকে শক্তি উৎপাদন করতে পারে। আর এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল কর্মক্ষম। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি কোনো মেকানিক্যাল মুভমেন্টের উপর নির্ভরশীল নয়, আর এই কারণে এর কর্মকাণ্ড শব্দহীন। শক্তি উৎপাদনের জন্য থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসের এক প্রান্ত উত্তপ্ত পৃষ্ঠতলের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতে হয়, আর এর ফলে ডিভাইসের আড়াআড়িভাবে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হয়। এই তাপমাত্রার পার্থক্যের ফলে থার্মোইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ শুরু হয়, যা পদার্থের মধ্যে তড়িৎ বাহকের সঞ্চালন শুরু করে। আর এর ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন শুরু হয়। থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির সবচেয়ে সফল প্রয়োগ এখনো পর্যন্ত হয়েছে মহাকাশ গবেষণায়, যেখানে রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন শক্তির প্রয়োজন, বিশেষত যেখানে সৌরশক্তি সহজলভ্য নয়।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) মহাকাশ গবেষণার জন্য এক বিশেষ ধরনের রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর তৈরি করেছে। এই জেনারেটরে একটি রেডিও অ্যাকটিভ কোর থাকে যা তাপের উৎস হিসেবে কাজ করে। রেডিও অ্যাকটিভ কোরকে ঘিরে অজস্র থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস সংযুক্ত করা থাকে। থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসগুলির আড়াআড়িভাবে প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হয় যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে। রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটরের ব্যবহারের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ক্যাসিনি (Cassini) মহাকাশযান। ক্যাসিনি মহাকাশযান ১৯৯৭ সাল থেকে দীর্ঘ ২০ বছর শনিগ্রহের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত ছিল যা রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর দ্বারা পরিচালিত হতো। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ২০১১ সালে নাসা দ্বারা প্রেরিত মঙ্গল যান কিউরিওসিটি (Curiosity)। এই মঙ্গলযান হলো মঙ্গলের পৃষ্ঠে চলনক্ষম একটি রোবট যা মঙ্গলের ভূপ্রকৃতির বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত এবং এখনো কর্মক্ষম। এই মঙ্গলযানও রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত ব্যবহারে মূলত ম্যাক্রোসাইজের থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির ম্যাক্রো হতে মাইক্রো ডাইমেনশনে বিবর্তন একান্ত আবশ্যক আর তার জন্য বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন।

পরিধানযোগ্য মাইক্রো-থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস আমাদের শরীর হতে মিলিওয়াট পাওয়ার উৎপাদন করতে সক্ষম যা বর্তমানে অনেক বৈদ্যুতিন ডিভাইসের চাহিদার জন্য যথেষ্ট। যেমন ECG এর জন্য ০.২ মিলি ওয়াট পাওয়ার যথেষ্ট। কিছু মার্কেট বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির বাজার ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। আর এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির বৈপ্লবিক বিকাশ প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন। তারা বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছেন। প্রথম ধাপ হলো এমন ধরনের পদার্থের উদ্ভাবন করা যার কর্মদক্ষতা বেশি হবে, অর্থাৎ কম তাপমাত্রা হতে বেশি পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো উদ্ভাবিত পদার্থের মধ্যে নমনীয়তা নিয়ে আসা যাতে করে এরা পরিধানযোগ্য ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো এমন কোনো পদ্ধতির বিকাশ করা যাতে করে ল্যাব স্কেল হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে থার্মোইলেকট্রিক পদার্থের উৎপাদন করা সম্ভব হয়। আর সর্বশেষ ধাপ হলো থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসের ডিজাইন ও তার নির্মাণ করা। বর্তমান গবেষণা এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে আগামী এক দশকের মধ্যে অনেক পরিধানযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে নিতে পারবে শরীরের তাপ থেকে, আর তা থার্মোইলেকট্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।

*(লেখক সুইডেনের লিংশপিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক)*


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

| | | |
|---|---|---|
| Account Name | : | **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.** |
| A/C. No. | : | **917020084983100** |
| IFSC Code | : | **UTIB0000005** |
| Bank Name | : | **AXIS Bank Ltd.** |
| Branch | : | **Shakespeare Sarani, Kolkata** |

# ধর্ম, ভাষা ও ভূখণ্ডের প্রেক্ষাপটে আজকের বাঙ্গালি




বাঙ্গালিত্বর্জিত আজকের বাঙ্গালি।

**নারায়ণ শঙ্কর দাস**

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ মহম্মদ্ শহীদুল্লাহ, আচার্য সুনিতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, আনিসুজ্জামান, আহমেদ রফিক প্রমুখরা দেখিয়েছেন যে বাংলাভাষার বয়স হাজার বছরের সমতুল্য। ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে বাঙ্গালিত্বের পরিচয় দেবার সময় পালবংশের কথাই বলা হয়। এটিই যথার্থ পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পালবংশের রাজাদের নামে কোনো রাস্তা বা স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় চারশো বছর ধরে একনাগাড়ে পাল রাজারা বঙ্গদেশ শাসন করে গেছেন। এই পালবংশের শাসনকালে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সীমানা কনৌজ পঞ্জাব অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। শুধু রাজনৈতিক নয়, শিক্ষাঙ্গনেও বঙ্গপ্রদেশের গৌরব নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগজ্জীবনপুর বিহারের খ্যাতির মতো ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

বাঙ্গালি বলতে বাংলাভাষী হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজনকেই বোঝায়। উল্লেখনীয় যে ১৮৭১ সালের জনগণনাতে সারা বঙ্গপ্রদেশে বাঙ্গালি হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল। কারণ ঊনিশ শতকে হিন্দু বাঙ্গালি আসমুদ্রহিমাচল বিজয়ী হয়েছিল। পাশাপাশি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমাপের বাঙ্গালিরও আবির্ভাব হয়েছিল সেসময়। ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ কোটি, মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৯ কোটি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষর মতো। আলি জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগের দাবি অনুসারে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। এরূপ দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ হলো দ্বিখণ্ডিত। একপ্রকার জোর করে। একটি হিন্দু অধ্যুষিত খণ্ডিত গণতান্ত্রিক ভারত, অন্যটি ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান। উল্লেখ্য, সংবিধান প্রণেতারা ভারতকেই কখনোই সেকুলার শব্দে ভূষিতা করেননি। ১৯৪৭ সালে বঙ্গপ্রদেশ দু-ভাগে বিভক্ত হলো। একটি হল কোরান ভিত্তিক পাকিস্তানের অর্ন্তগত পূর্ব বঙ্গ যা অধুনা বাংলাদেশ এবং অন্যটি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৬ কোটি ৩০ লক্ষের মতো (বর্তমান বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙ্গালির সংখ্যা ২৪ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে)। আর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৩৬ জন (জনগণনা ২০১১। এখানে সংখ্যালঘু মুসলমান জনসংখ্যা ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৭.১ শতাংশ হয়েছে)। জেনে রাখা দরকার, ১৯৭১ সালের জনগননা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪.৫ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের পর ভরতে সবচেয়ে বেশি বাঙ্গালি বাস করেন অসমে। ২০১১ জনগননা অনুযায়ী, আসামে মোট জনসংখ্যা হলো ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৭৬ জন। স্বাধীনতার পর অসমে হিন্দু এবং মুসলমান বাংলা ভাষাভাষীদের যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এসবই ১৯৪৭ সালের বিকলাঙ্গ স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষময় ফল।

যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বাংলাভাষী হিসেবে যাঁরা বাঙ্গালি বলে পরিচিত, তাঁদের ৭০ শতাংশই মুসলমান। অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও উপজাতি বাঙ্গালি। অর্থাৎ বাঙ্গালির উত্তরাধিকার বলতে সংখ্যাগত দিক থেকে বাঙ্গালি মুসলমানকেই বোঝায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানলে এই রূঢ় সত্য মানতেই হবে। বাংলাদেশি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ দাবি করেছেন যে সংখ্যাগত ভাবে মুসলমান বাঙ্গালিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব মুসলমান বাঙ্গালিই বাঙ্গালি বিশেষণ ব্যবহারের বৈধ উত্তরাধিকারী। অন্তত গণভোটের রায়ে মুসলমান বাঙ্গালিই আসল বাঙ্গালি হয়ে যেতে পারেন একথা অনেকেই মনে করেন। ১৯৪৭ সালে অখণ্ড বঙ্গের জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ ছিল অমুসলমান। তার মধ্যে ৪২ শতাংশ হিন্দু, ৪ শতাংশ বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। ৫৪ শতাংশ ছিল মুসলমান জনসংখ্যা। ৭০/৭২ বছরে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৫৪ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬৭/৬৮ শতাংশ। অপরদিকে হিন্দু বাঙ্গালির সংখ্যা ৩০/৩১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাকি ২ শতাংশ বৌদ্ধ

ও খ্রিস্টান।

দুর্ভাগ্য, বঙ্গপ্রদেশে নবজাগরণ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অবশ্যই সর্বাগ্রে। রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো বিশ্বমাপের বাঙ্গালির আবির্ভাব এই বঙ্গপ্রদেশে। তা সত্ত্বেও বাঙ্গালি হিন্দুর সংখ্যা কমে গেল কেন? অন্যদিকে যেখানে মুসলমান শাসন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কয়েক শতাব্দীকাল ধরে, সেই উত্তর ভারতে (আর্যাবর্তে) মুসলমান সংখ্যা এত কম কেন? এ প্রশ্ন তুলেছিলেন আপাদমস্তক তথাকথিত সেক্যুলার অন্নদাশংকর রায়। তিনি বলেছিলেন, পঞ্জাবে ও বঙ্গপ্রদেশে মুসলমান সংখ্যা এত বেশি কেন? তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর খোঁজেননি। এখনও উত্তর খোঁজা হচ্ছে না। অথচ উত্তর খোঁজাটা এবং জানাটা জরুরি বিষয়।

আবার বাংলাভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বব্যাপী পালনে বাংলাদেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন এবং আত্মত্যাগই সর্বাগ্রে। সে কথা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। আর ইতিহাস এজন্য হয়তো পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। কেননা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারির শেকড় ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বঙ্গে। সে সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী বলেছিলেন। পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ছিল পূর্বপাকিস্তানের বাংলাভাষাভাষী। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। দিনটা বৃহস্পতিবার। ঢাকা শহরের বিশাল রমনার প্রান্তর। সেদিন সকাল থেকেই রমনার মাঠ মুখর হয়ে উঠছিল—'উর্দু নয়, বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষা চাই।' তখন নির্মম নিষ্ঠুর শাসকশ্রেণী তার উদ্যত রাইফেলের গুলি বাংলাভাষা মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামের সৈনিক বরকত, রফিক, সালাম, জব্বারদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ফলে জন্ম নেয় ভাষা আন্দোলনের বহ্নিশিখা। এরপর এল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য। সেদিন পালিত হয় বিজয় দিবস। ফলস্বরূপ জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। রাষ্ট্রভাষা হয় বাংলা। সেই ঐতিহাসিক কারণেই ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ 'বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক সংস্থা' কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ওই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিলেন আলবার্ট ভিনজন, কারমেন ক্রিস্টোবাল, জেসন মরিন, সুসান হজিনবা, কেলভিন চাও, নাসরিন ইস্‌লাম, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ ৭টি ভাষার দশজন ভাষাপ্রেমিক পণ্ডিত। এরই সূত্র ধরে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনেস্কো মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বের পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরপর ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের উৎসব।

একটা কথা জেনে রাখা ভালো, ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য কী, তা সঠিকভাবে এখানে চিহ্নিত করা যায়নি। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যেই কোনো মতৈক্য গড়ে উঠেনি এখন পর্যন্ত। বর্তমানে ছয় হাজারের একটু বেশি মাতৃভাষা রয়েছে পৃথিবীজুড়ে। ভারতেই রয়েছে সর্বমোট ১৬৫২ টি মাতৃভাষা।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থাকা সত্তেও বাঙ্গালির সংখ্যা আনুমানিক ৩০ শতাংশে নেমে গিয়েছে। অসম, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ধরে। এছাড়াও সমগ্র বঙ্গভূমির দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু বাঙ্গালির হাতে নেই। কী বিচিত্র পরিহাস ইতিহাসের। ভূমি ও জনসংখ্যা দুভাবেই হিন্দু বাঙ্গালি আজ সংকুচিত।

যদিও শতাংশের বিচারে মুসলমানদের জীবন ও জীবিকা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভীষণ নিম্নগামী। আর বাঙ্গালি হিন্দুদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেকটাই উর্ধ্বগামী। ১৮৮৮ সালে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছিলেন—"অতীতে একজন উচ্চকুলের মুসলমানের গরিব হওয়া ছিল অসম্ভব। এখন ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব।" ২০০৫ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টে ১১৭ বছর পরেও সেই তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে দেশের মুসলমান সমাজ সারা দেশে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেও আরও বেশি বেশি দরিদ্র হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের তিন তালাক আইন মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা কল্যাণকামী প্রভাব ফেলবে, তা আগামী দিনই সাক্ষ্য দেবে। তবে তা সময়সাপেক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ২৭.১ শতাংশ হলেও (যদিও তা এখন ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে বলে মনে করা হয়।) সরকারি ক্ষেত্রে মাত্র ৪.২ শতাংশ মুসলমান। অথচ গুজরাত রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা সেই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫.৪ শতাংশ হলেও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান কর্মচারী ৯.১ শতাংশ। কঠিন বাস্তব এটাই যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের গরিষ্ঠঅংশ যেভাবে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন করে আসছে এবং এসেছে, অর্থাৎ কংগ্রেস জমানায় কংগ্রেসকে, বামফ্রন্ট জমানায় বামফ্রন্টকে কিংবা তৃণমূল জামানায় তৃণমূলকে, গুজরাতের ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা নয়। অথচ শতাংশের বিচারে গুজরাতের মুসলমানেরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু রাজ্যের চাইতে অনেকটাই ওপরে। অন্তত ২০০৫ সালের সাচার কমিটির রিপোর্ট তো একথাই বলে। এও হয়ত ইতিহাসেরর একটা খেলা যা আমাদের মতো আত্মকেন্দ্রিক ও ভোটকেন্দ্রিক মানসিকতার ধ্বজাধারী মানুষদের বুদ্ধির অগম্য।

স্বাধীনতা প্রাক্ পর্বে বাঙ্গলার সর্বস্তরে সিংহভাগ মানুষের মনোভাব ছিল, আমাদের যত সমস্যা সেসবের জন্য একমাত্র ইংরেজ শাসন দায়ী। পরবর্তীকালে এটি জাতীয় মুদ্রাদোষে পর্যবসিত এবং যা এখনও রয়েছে। এই আচরণকে এ যুগের বুদ্ধিদীপ্ত তরুণরা মুদ্রাদোষ বলছেন। এরই পাশাপাশি, ১৯৭৭ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত হিন্দু বাঙ্গালিরা নিজেদের অসামর্থ্যতা, নিশ্চেষ্টতা এবং অপারাগতা ঢাকতে সব ব্যাপারে কেবলই কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আর দোষ খুঁজে বেড়াই। যে কোনো ব্যতিক্রমী দিক্‌কে আমরা যুক্তির পরাকাষ্ঠায় স্বাভাবিক ও সার্বজনীন করে তুলি। ১৯০৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভিন্ন আঙ্গিকে যথার্থই লিখেছিলেন—'বাঙ্গালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।'

আসলে ৭৫০ বছরের পরাধীন মানসিকতার উত্তরাধিকারী হিন্দু বাঙ্গালি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের সুবিধাবাদী ব্যবহার সত্ত্বেও আমরা চিরন্তনভাবে, নিজেদের অস্তিত্বের কারণে, এক নৈতিক জগতের অধিবাসী। আমাদের ভাসাভাসা নৈতিক উৎকৃষ্টতা ও কাজকর্মে প্রকট অনৈতিকতা এই দুয়ের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। এ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে একে অন্যকে দোষারোপ করে আমরা অধিকাংশই এগিয়ে চলেছি এক গড্ডলিকা প্রবাহে। ■

# নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নীরব অবলুপ্তি

**কৃষ্ণ প্রসাদ বিশ্বাস**

একেই বোধ হয় বলে বিনাশ কালে বুদ্ধি ভ্রম! নইলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এই সংকটকালে মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যের হাতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভালো মন্দ বিচারের ভার! নমশূদ্র বিকাশ পরিষদ কী কী তার ক্ষমতা, কী তার উদ্দেশ্য, তা খায় না মাথায় মাখে, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় তা বুঝে ওঠার আগেই বিকাশ পরিষদের নেতা হিসাবে বৈরাগ্যবাবুকে দেখা গেল ক্ষয়িষ্ণু রাজ্য সরকারের সুরে সুর মেলাতে। যে বেচারা জনপ্রতিনিধি নন তিনি কতজন শূদ্রের অভিমত নিয়ে একাজ করছেন? নাগরিকত্ব বিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কী ক্ষমতা? আদৌ এ বিল পাশের ক্ষেত্রে তাদের সদিচ্ছা আছে কি-না এই বিষয়ে সাত পাঁচ না ভেবে কেন্দ্রের বিরাগভাজন হওয়া বোধহয় বৃহত্তর শূদ্র সমাজের মধ্যে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছে। শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন তো ছিলই হয়তো সেকারণেই তা এবার ত্বরান্বিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে আজ তাই কাতারে কাতারে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন। কী শক্তি আছে মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যের যিনি এই বৃহত্তর ভাঙন থেকে শূদ্র সমাজকে রক্ষা করবেন? তাঁর কাছ থেকে আর কিই বা পাওয়ার আছে! তিনি শূদ্রদের আকৃষ্ট করে রাখবেন চির বঞ্চনার চির উপক্ষোর শূদ্রত্বে!

বর্তমানে মতুয়া সম্প্রদায়ের যিনি নেতৃত্বে রয়েছেন শূদ্র জাগরণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের যে অবদান যে ত্যাগ তা সর্বজনবিদিত। শান্তনু ঠাকুর বর্তমানে তিনি একজন জনপ্রতিনিধি, জননায়ক; ব্যাপক তাঁর সম্মোহনী শক্তি। তিনি চালিত হন জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে। মতুয়াদের এবং বৃহত্তর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে তার পূর্বপুরুষ শ্রীশ্রী হরি চাঁদ— গুরুচাঁদ ঠাকুরের রয়েছে সুদূর প্রসারী প্রভাব। 'যার নাই দল তার নাই বল' কিংবা 'হাতে কাম মুখে নাম' এ তো বাণী নয়, ভক্তদের কাছে যেন বৈদিক মন্ত্র। শূদ্র সম্প্রদায় থেকে পরিবর্তিত হওয়া মতুয়া সম্প্রদায় এবং অবশিষ্ট শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের পথনির্দেশ রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায় হয়তো তা মজ্জাগত হয়ে গেছে। তদুপরি সম্মাননীয় সাংসদ মতুয়া মহা সঙ্ঘের



সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের নির্লোভ নিরহংকারী মানসিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রাম স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে জননায়ক করে তুলেছে। সবচেয়ে বড়ো যে কথা সর্বহারারা তাঁকে ভরসা করা শুরু করেছেন। এমন নয় যে যারা শুধু বিজেপি করে তাদেরই তিনি আকৃষ্ট করে রেখেছেন। তার জাতপাত হীন এহং বিভেদ হীন মানসিকতায় আজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে তিনি নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন। একবার ভাবুনতো গত লোকসভা উপনির্বাচনে তাঁরই সহোদর যেখানে তিন লক্ষাধিক ভোটে পিছিয়ে ছিলেন সেখানে আজ তিনি কোন জাদুবলে বিপুল ভোটে জয়ী হন? এমনকী নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বিজেপির সংগঠনের সঙ্গে মৃদু সংঘাতের কথা কে না জানে। আজ বাপের বয়সিরা পর্যন্ত শান্তনু ঠাকুরের মহিমার কাছে বিনম্র শ্রদ্ধায় মাথা নত করছেন। প্রশ্ন সে কোন মহিমার গুণে?

মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো তাঁর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে এমন কিছু জানা যায় না যা অতীত শূদ্র জাগরণের সহায়ক ছিল। তদুপরি তার নিজস্ব কোনো জনভিত্তিও নেই। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার শূদ্র জাগরণের এক হোতাকে আমি বৈরাগ্যবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে উনি বেশ কিছুক্ষণ আমতা আমতা করেন। কে, মুকুল? মানে আসলে আমি বলতে চাইছি সমন্বয়ের অভাবের কথা। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে যে সমস্ত গুণীজন রয়েছেন, যাদের কল্যাণমূলক কাজের সংগ্রামী ইতিহাস রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয় কোথায়? একা মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য কি শূদ্রদের ভাঙন রোধ করতে পারবেন? সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনর্বাসন এবং নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সরকার ২০১৪, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে বাংলাদেশ-সহ কতিপয় দেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলেছেন। এটা ঠিক নাগরিকত্ব বিল পাশ না করে অসমের মতো রাজ্যে এনআরসি করা ঠিক হয়নি। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার তা যে বুঝতে পারেনি এমন নয়। তাই এনআরসি-র উপযোগিতা না বুঝে আগ বাড়িয়ে তার বিরোধিতা করতে যাওয়া শূদ্র

সম্প্রদায়ের কাছে যেমন আজব লেগেছে তেমনি রাজ্য সরকারের তোষামোদ করতে গিয়ে বৈরাগ্যবাবু শূদ্রদের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন। পাল্লা কেপিসি উচ্চবিদ্যালয়ে বিকাশ পরিষদের একটি সভায় যে মুহূর্তে তিনি রাজ্য সরকারের সহযোগিতার কথা বলতে যান অমনি সমাগত লোক সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। আশাহত লোকেদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের টাকা রাজ্য সরকারের গুণগান প্রচারের জন্য বৈরাগ্যবাবু এই ভাবে খরচ করে চলেছেন? সেটা তো মারাত্মক রকমের অপরাধ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছে নাগরিক বিল পাশ হয়ে গেলে অসাম্যের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা একজন উদ্বাস্তু অসমের শিকার হবে না তখন সেই সরকারের বিরাগভাজন না হয়ে বরঞ্চ তার উপর ভরসা রাখাই শ্রেয়। এমনকী বর্তমানে উদ্বাস্তু আন্দোলনের যিনি প্রাণপুরুষ সেই সুবোধ বিশ্বাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এই সদর্থক মানসিকতার জন্য তার সারা ভারত বাঙ্গালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির হয়ে আশা পোষণ করেছেন। নাগরিক বিল যাতে সত্বর পাশ হয় তার জন্যে ডক্টর বিশ্বাসের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াসেরও অন্ত নেই। তার সাফ কথা নিঃশর্ত নাগরিকতা দানে কেন্দ্রীয় সরকার বিন্দুমাত্র টালবাহনা করলে কোনো ক্ষমা নেই, গড়ে তোলা হবে জোরদার আন্দোলন।

কেন্দ্রের আনা নাগরিকত্ব বিলের কতগুলো বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিলে পরিষ্কার বলা আছে ১৯৭১ সালের পরে ওপার বাংলা থেকে আসা একজন মুসলমানকে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। এটা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও বটে। রাজ্য সরকার সুদ্ধ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে তাদের 'দুধ দেওয়া গোরু'র সঙ্গে তুলনা করে এনআরসি-র মতো সময়োপযোগী মহতী প্রয়াসকে বানচালের চেষ্টা করে চলেছে। ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুরা কিন্তু ঢাকার দাঙ্গা, কোজাগরী পূর্ণিমা রাতে নোয়াখালির দাঙ্গার কথা ভোলেননি। আগে বুঝতে হবে বৃহত্তর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নাড়ির স্পন্দন। বৈরাগ্যবাবু ভুলে গেলেও উদ্বাস্তু হিন্দুরা ভোলেনি প্রিয় মাতৃভূমিকে কেন তাদের ছেড়ে আসতে হয়েছে। আজ নাগরিকত্ব বিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বাধা কোথায়? এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক বিল পাশের পর এন আর সি হলে ১৯৭১ সালের পর ওপার বাংলা থেকে আগত মুসলমানদের একটা বিরাট অংশকে হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে নতুবা দেশ ছাড়া হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত রাজ্য সরকারের দরদ তাদের প্রতিই সবচেয়ে বেশি। কারণ তারা রাজ্য সরকারের কাছে 'দুধ দেওয়া গোরু'। মুকুলবাবুর দূরদর্শিতার অভাব এখানেই। ক্ষয়িষ্ণু রাজ্য সরকারের তোষামোদ করতে গিয়ে বিলের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছেন যা বোধ করি কোনো নমঃশূদ্রের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। আর জেনে বুঝে তিনি যদি ভাবের ঘরে চুরি করতে যান ভবিষ্যৎ অনেক পরিণাম নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। কাল যে তাকে ক্ষমা করবে না সে কথাও আমি হলফ করে বলতে পারি।

'৭১ সালের পরে আসা যে লোকগুলোর জন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজ নাকের জল চোখের জল এক করছেন অন্তত উদ্বাস্তু নমঃশূদ্ররা কোনোদিনই ভুলবেন না ওই লোকগুলোই তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়েছে। জানি না কীসের স্বার্থে কোন লোভে আজ বৈরাগ্যবাবুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে আপনার ব্যক্তিগত লাভ হলেও শূদ্র সম্প্রদায়ের তা কোনো উপকারে আসবে না। শূদ্রদেরকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ করতে হয়, ভাঙন যদি রদ করতে হয় উদার মনে আলোচনায় বসতে হবে ড. সুবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে। জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুর-সহ আরও যাঁরা সংগ্রামী মানুষ আছেন তাঁদেরকে এক ছাতার তলে আনতে হবে। ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে হবে শূদ্রদের কাছের মানুষ। এগিয়ে যেতে হবে তাদের রায় নিয়ে। আপনার রায় শূদ্রদের উপর চাপিয়ে দিলেতো হবে না, যেখানে আপনি জনপ্রতিনিধি নন।

শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে ভাঙন তা দ্রুত রুখতে হলে বৈরাগ্যবাবুকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। অর্জন করতে হবে তাদের বিশ্বাস। মনে রাখতে হবে, শূদ্র সম্প্রদায়ই যদি না থাকে তবে তার বিকাশ পরিষদে লাভ কোথায়? নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের দায়িত্ব পাওয়ার পর এযাবৎ শূদ্র উন্নয়নের জন্য আপনি কী করতে পেরেছেন আশু তার একটা খতিয়ান তুলে ধরা দরকার। যদি রাজ্য সরকার আপনার চাহিদা পূর্ণ করার গরজ না দেখায় চাহিদা পূরণের ক্ষমতা না থাকে তবে তার চাটুকারিতা করে কী লাভ? তদুপরি বর্তমান রাজ্য সরকার অদি দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু একটি দল, এমনকী আগামী নির্বাচনে তারা হয়তো ক্ষমতাও হারাবে। সুতরাং যে দল শূদ্রদের মূল যে দাবি নাগরিকত্বের তা পূরণ করতে পারবে না বা পূরণের ক্ষমতা রাখে না শুধু লোক দেখানো পরিষদ তৈরি করে আপনাকে বিড়ম্বনায় ফেলবে, আমার কথা সে দলের তল্পিবাহক হওয়াতো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরঞ্চ নাগরিকত্ব বিল কীভাবে পাশ করানো যেতে পারে সে বিষয়ে কৌশলী হতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে কারো অভিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে আম ছালা দুটোই হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। আমার মনে হয়, শূদ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে নামতে গিয়ে বরঞ্চ যদি সমঝোতা করে লাভ হয় তবে তাই করা উচিত। শ্রীমান শান্তনু ঠাকুর যদি কেন্দ্রীয় সহায়তায় মতুয়াদের দাবি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়, অবহেলিত শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষরাই বা তখন কেন শূদ্রত্বে পতিত হয়ে থাকবে? গুজব কিনা জানি না, তবে এটা জনরব বৈধ মতুয়া কার্ড থাকলে ভারতবর্ষের বুকে কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। অথচ ক'দিন আগে মাত্র বিকাশ পরিষদের কর্ণধারকে জনৈক গায়ককে অবৈধ অভিবাসনের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে ফেসবুকে করুণ ভাবে তার জন্য আইনি সহায়তা প্রার্থনা করতে দেখা যাচ্ছে। এ কত বড়ো অসহায়তা! আজ নাগরিকত্ব বিল পাশ করে শান্তনু ঠাকুর যদি উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অভিশাপ মোচন করতে পারে তবে শূদ্র জাগরণের প্রভাতী তারা গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতো শান্তনু ঠাকুর হবেন শূদ্র সম্প্রদায়ের নয়নের মণি আর কাতারে কাতারে নমঃশূদ্ররা সেদিন অভিশাপ মুক্তির লক্ষ্যে দীক্ষিত হবে মতুয়া ধর্মে। বৈরাগ্যবাবু কী পারবেন সেই ভাঙন রক্ষা করতে, হয়তো ভবিষ্যৎই তার জবাব দেবে।

*(লেখক উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)*

# চিঠিপত্র

## কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা

দেশভাগের পর জওহরলাল নেহরুর অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার ছিল 'ভারতকে হিন্দু পাকিস্তান করা চলবে না' ধর্ম, ভাষা ও বর্ণের সম অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতা অর্জনের তিন মাসের মধ্যেই নেহরু দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখলেন পাকিস্তানের প্ররোচনা অমুসলমানদের প্রতি তাদের অবিচার ও পীড়ন যতই ভয়াবহ হোক না কেন, সংখ্যালঘুদের প্রতি আমরা সুভদ্র আচরণ করব। তাদের নিরাপত্তা, তাদের নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতেই হবে। এক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে বিষাক্ত আবহাওয়া আমাদের রাজনীতিকে গ্রাস করে নেবে। সম্ভবত ধ্বংস করে দেবে।

১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে নয়া দিল্লিতে কংগ্রেস অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর সংযত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো 'ইউ রিপ্রেজেন্ট দ্য ওসেন অব ইন্ডিয়ান হিউম্যানিটি। ইন্ডিয়া ডাজ নট বিলং টু হিন্দুজ অ্যালোন 'নেহরু আর গান্ধীর উপর ভরসা করল ভারতীয় মুসলমানরা। রক্তক্ষয় আর পাকিস্তানি উস্কানিকে অস্বীকার করে তারা ভারত ছাড়ল না।

**—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪

## পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ চলছে

কলকাতা শহরের বুকে ও তার আশপাশ এলাকায় যে জঙ্গলরাজ চলছে তার ভয়াবহতা একমাত্র বাইরে থেকে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বাড়ি ভাড়া নিতে হলে ওই এলাকার দালাল চক্রকে বাড়ি ভাড়ার সমান টাকা ঘুষ দিতে হয় নইলে বাড়িভাড়া পাওয়া মুশকিল। শিয়ালদহ থেকে দমদম যেখানেই বাড়িভাড়া নাও দালালদের তোলা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই প্রথা নাকি বাম আমল থেকে চলছে বলেই প্রচলিত। মাগনা খাওয়া, ফোকটে খাওয়া, মস্তানি করে খাওয়া, ধমকি দিয়ে আদায় এই ধারবাহিক অভ্যেস দালালদের বংশ পরম্পরা ধরে চলা জীবিকা। আমাদের গায়ের রক্ত জল করা, গায়ে গতরে খেটে উপার্জনের অর্থ এক লহমায় দালালদের হাতে চলে যায়। তখন সেই মানুষটির মনের ভিতরে কাঁদতে থাকে এবং অভিশাপ দেয় ওই দালালকে, ওই এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ওয়ার্ড কমিশনারকে। তোলাবাজি, কাটমানি, সিন্ডিকেট অভিশপ্ত প্রথাগুলি সত্যিই কি বিজেপি এলে বন্ধ হবে? জমি জায়গা কিনতে হলে জমির দালাল ছাড়া হবে না। বালি ও পাথর সিন্ডিকেট ছাড়া কেনা যাবে না। খতিয়ান বের করতে হলে ভূমি অফিসে ঘুষ। দলিল হাতে পেতে হলে রেজিস্টারকে ঘুষ।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ওপেন সিক্রেট প্রথা আদৌ কি বদলাবে বিজেপি এলে? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। 'যেন তেন প্রকারেণ' পশ্চিমবঙ্গ দখল করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজেপির নাহলে দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে বেশি দেরি নেই।

বিজেপিতে এলে তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের আগে সাধু হতে হবে এবং যারা আরও দুর্নীতি করবেন ভেবে এসেছেন, দল থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই দিলীপদার হাতে তৈরি বঙ্গ বিজেপির প্রভাব ও প্রসার দিন দিন গগনচুম্বী হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে যা বলছেন এই একই কথা মমতাও বলেছিলেন। কিন্তু কথা ও কাজে এই নয় বছরে মমতার কোনো মিল পাইনি, উল্টে কাটমানি তোলাবাজি সিন্ডিকেট এগুলি আরও বেশি বেড়েছে। সর্বশেষ চিত্র যা সামনে এসেছে তা আরও হাস্যকর। বিজেপিতে পা বাড়িয়ে রয়েছে এদিকে কাটমানির লোভও ছাড়তে পারছে না। তাঁরা লোকাল বিজেপি নেতাদের বলছেন আর কয়েক মাস কামিয়ে নিই তারপর ফুলফর্মে সময় দেব। মোদ্দা কথা এই নেতারা সাধারণের পকেট কেটে নিজের পকেট ভরবে। আবার এরাই স্লোগান দেবে দুর্নীতি হতে দেব না? কাটমানি তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের বন্ধ করতে হবে? ''তারপরেই মিছিল শেষে চায়ের দোকানে বসে বলবে অমুক লোকটা জমি কিনেছে কই ডোনেশন তো দিল না। কালকে মালটাকে রাস্তায় ধরতে হবে''।

তাই, একটা প্রশ্ন থেকেই যায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তোলাবাজদের তোলাবাজি বন্ধ হবে তো? শোভন ও বৈশাখীর বিজেপির যোগ তাৎপর্যপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু একদা দুঃসময়ে নানান ঘাত প্রতিঘাতে বিজেপিকে আগলে রাখা সৈনিকরা যাতে হারিয়ে না যায় সেইদিকে নজর দেবেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাইছে বিজেপি এলে কাটমানি ও তোলাবাজি প্রথা বন্ধ হবে কারণ, 'না খায়ুঙ্গা, খানে নহি দুঙ্গা' মোদীর সাবধান বাণী বেশ প্রচার পেয়েছে বলেই বঙ্গবাসী ভরসা রেখেছেন মোদীর উপর। সেই লক্ষ্যে মহিলারা কোমর বেঁধে নেমেছেন দেশের শুভ চিন্তক মানুষটির দিকে তাকিয়ে।

**—রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

## গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা

প্রায় সাত-আট মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-১ এবং পার্ট-২ পরীক্ষা ঘোর অনিশ্চয়তা এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হলো। বালুরঘাট, মালদহ, কালিয়াগঞ্জ, চাঁচল, কলেজের বহু ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডমিট কার্ড না আসায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক

ছাত্র-ছাত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন, রেজিস্ট্রার, ইন্সপেক্টর অব কলেজেস দপ্তর থেকে কিছুই জানানো হয়নি। ইদানীং অনলাইনে ভর্তি-সহ ফর্ম ফিলাপের যাবতীয় কাজ হওয়াতে কলেজগুলোর অশিক্ষক কর্মীদের কোনো কাজই নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক বাড়তি টাকা সাইবার ক্যাফে আদায় করে নিচ্ছে। অ্যাডমিট কার্ড কিংবা মার্কশিট-এর ব্যাপারে অশিক্ষক কর্মীরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে বহু আগেই।

তারা সারাদিন কলেজের কাউন্টারে বসে মোবাইলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টিক্ টক্, ইনস্টাগ্রাম, ভিগো ভিডিও করে চলেছে। সাইবার ক্যাফে থেকে ভুল অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা হলে কলেজের অশিক্ষক কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের আবার সাইবার ক্যাফেতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোনো আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না। যদি কোনো আধিকারিককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে ধরা যায় তখন তারা বলে দেয় কলেজের অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু কলেজের কর্মীরা তো হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ফোন চ্যাটিং, অনলাইন শপিং নিয়েই ব্যস্ত। বহু কর্মচারী কলেজের কম্পিউটারে ফিল্ম দেখে সময় কাটায়। কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি প্রভৃতি কলেজে থেকে চার-পাঁচ ঘণ্টা ব্যয় করে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিক অ্যাডমিট কার্ডের জন্য পৌঁছেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না।

অন্য একটা ভয়ানক চিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দালাল এবং ছাত্র নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা তিন-চার হাজার টাকা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে অ্যাডমিট কার্ড তুলে দিচ্ছে। বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে এক একটা অ্যাডমিট কার্ডের জন্য ২৫০-৩০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। ইদানীংকালে কলেজগুলোতে শুধুমাত্র স্নাতক স্তরের পরীক্ষাই হয়। আর সব কাজ হয় অনলাইনে। সেখান থেকে গাদাগাদা ভুলে ভরা অ্যাডমিট কার্ড ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই পরীক্ষা শেষে যখন মার্কশিট ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেখানেও থাকবে লক্ষ লক্ষ ভুল। আর ভুল মার্কশিট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে এবং বিক্ষোভ জানালে পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীরা ছাত্র-ছাত্রীদের বেদম প্রহার করবে। ভাইসচান্সেল্যারের কাছে পৌঁছানো যাবে না কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন না।

**—তনিমা রায়,**
কলেজপাড়া, কালিয়াগঞ্জ।

# সহিষ্ণুতা মানবিক চেতনার পটভূমি

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, ''এক গালে চড় মারলে আর এক গাল এগিয়ে দাও।'' এটা শুধু জাতির পিতার কথাই নয়, এটা ভারত সংস্কৃতি। সদ্য সমাপ্ত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এক নির্বাচনী সভায় 'দিদির থাপ্পড় আমার আশীর্বাদ' বলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমার মনে হয় মানুষ যদি সহিষ্ণুতা হারিয়ে শুধু হিংসার আশ্রয় নেয়, তবে মানব সভ্যতা মুছে যাবে এ পৃথিবী থেকে।

আজ স্বাধীনতার ৭২ বছর পর ভারতবাসী চোখের আলোয় যা পরিদর্শন করছেন, মনের আলোয় তা মিলিয়ে দেখছেন, মানুষ হিংসায় কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট থেকে মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, দিল্লিতে শুরু করে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, পরের বছর কাশ্মীর আক্রমণ। অন্যদিকে কংগ্রেস দেখিয়েছে ক্ষমতার লোভে অদূরদর্শিতা, স্বার্থপরতায় কতটা নীচে নামা যায়। যার ফলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন এখনো অসম্পূর্ণ।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসকেই অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজার বিসর্জন বন্ধ রেখে মহরম ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদার সংরক্ষণ করছে। আবার ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলগণ বিদ্যালয় মাঠে নামাজ চলবে কিন্তু সরস্বতীপূজা বন্ধের কথা বলছেন, ধর্ম কুসংস্কার বলে গোরুর মাংস সেবন, কিন্তু শুয়ারের মাংস সেবন টিভির পর্দায় দেখানো যায় না, একই ভাবে মোমবাতি প্রজ্বলন, স্বার্থান্বেষী বিদ্বজ্জনের মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি ভারতবাসী দর্শন করছেন। এই ঘটনার ঘনঘটায় এই বঙ্গেরই এক মহামানবের বাণী স্মরণে আসছে—''সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'' তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

**—রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রানিগঞ্জ,
কোচবিহার।

# মমতার চমক

মমতা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সস্তা রাজনীতি করে চলেছেন। তার মধ্যে নতুন হলো কাটমানি ফেরত দেওয়া। সকলেই জানে এবং তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ও বলেছেন যে, কাটমানি নেওয়া হয়েছে চেন সিস্টেমে, ফেরতও যেন দেওয়া হয় চেন সিস্টেমে। এরকম যেন না হয়, নীচের তলার কর্মীরাই টাকা ফেরত দিল, কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দিল না। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো মন্তব্য করেননি। তাই তাঁর অভিপ্রায় বোঝা দুষ্কর নয়। কাটমানি ফেরত দেওয়া পুরোপুরি মমতার চমক—সস্তার রাজনীতি।

**—শঙ্কর দাস,**
হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়ান

# গোলাপের সুগন্ধ এবং মহিলা সশক্তিকরণ

অঙ্গনা

**সুতপা বসাক ভড়**

সফলতা একদিনে আসে না, কিন্তু একাগ্র সাধনা থাকলে একদিন না একদিন সফলতা আসবেই। এইরকম কিছু ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের সীমান্তে চামোলী জেলার জোশীমঠ ক্ষেত্রের এক ডজন গ্রামের কয়েকশো মহিলার জীবনে। গোলাপ চাষ করে আজ তাঁরা আর্থিক স্বাবলম্বনের এমন উদাহরণ পেশ করেছেন, যা অনেকের কাছে অনুসরণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের এই সাফল্যের পথপ্রদর্শক হলো দেরাদুনের সুগন্ধ পৌধা (ছোটো গাছ) কেন্দ্র (ক্যাপ)। বর্তমানে এই এলাকায় গোলাপজল, তেল এবং গাছের অন্যান্য জিনিস থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা আমদানি হচ্ছে। তাও সম্পূর্ণ কৃষিজমিতে নয়, কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রের সীমানা ফসল হিসেবে। এই কাজ ওই মহিলাদের কতটা উৎসাহিত করেছে, তা পরসারী গ্রামের কমলাদেবীর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলছেন যে, গোলাপ চাষ করে তাঁদের জীবন গোলাপের মতো সুগন্ধময় হয়ে উঠেছে। এর থেকে উপার্জন ভালো হচ্ছে এবং তাঁদের জীবনজীবিকাও আগের থেকে ভালো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁদের কাছে এটা খুবই গৌরবের কথা যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোশীমঠের মহিলা কৃষকদের দ্বারা তৈরি গোপাল তেলের প্রশংসা করেছেন।

প্রতিকূল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এবং বন্যজন্তুর হামলার কারণে উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য এলাকা স্থানীয় লোকজন পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে। সেজন্য ওইসব অঞ্চলে কৃষিকাজও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কৃষিকাজকে উৎসাহ দিয়ে লাভজনক বানানো যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং গোলাপচাষকে এর একটি বিকল্প হিসেবে মানা হয়েছে। চামোলীর জোশীমঠ ক্ষেত্রে এই কৃষিকাজ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সুগন্ধ সোধকেন্দ্র বা ক্যাপকে দেওয়া হয়েছে। ওই ভৌগোলিক এলাকায় মানিয়ে নেবে এমন চিন্তাভাবনা করে ডেমস্ক গোলাপের নুরজাহান, জ্বালা এবং হিমরোজ প্রজাতি চয়ন করেছে এবং এরপর ২০০৫ সালে কৃষিক্ষেতের সীমানাতে



বাউন্ডারি ফসল হিসাবে গোলাপ গাছ লাগানো শুরু করে। এর জন্য ওই অঞ্চলের মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। সর্বপ্রথম জোশীমঠের প্রেমনগর, পরসারী এবং মেরঙে বাউন্ডারি ফসল হিসেবে গোলাপের চারা বসানো হয়েছিল।

দুবছর পরে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং মহিলা কৃষকেরা এর থেকে গোলাপজল তৈরি করেন। ধীরে ধীরে এই কাজে অন্য গ্রামের মহিলারাও যোগদান করেন। বর্তমানে ডেমস্ক রোজের জন্য জোশীমঠ একটি ক্লাস্টারের মতো করে বিকশিত হয়েছে এবং এখানকার সলধার, রৈনী, মেরং, গণেশপুর, পরসারী, করছী, বড়াগাঁও, সুনীল, ওঠনী, দ্বীঙ্গ, তপোবন সমেত ১২টি গ্রামের ১০ জন গোলাপের চাষ করছেন। এদের মধ্যে ৫৪ জন মহিলা। পরসারী গ্রামের কৃষক কমলাদেবী জানিয়েছেন যে কৃষিক্ষেত্রের সীমানায় গোলাপ গাছ লাগানোর ফলে বন্যজন্তুর হাত থেকে ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। দ্বীঙ্গ গ্রামের পুষ্পাদেবী এবং তাঁর পরিবার গোলাপের চাষ করছেন। এদিকে, দেরাদুনের সুগন্ধ পোধাকেন্দ্র, নির্দেশক ড. নৃপেন্দ্র চৌহান জানালেন যে, জোশীমঠ ক্লাস্টারের কৃষকেরা, বিশেষত মহিলা কৃষকেরা গোলাপের চাষে খুবই উৎসাহী। কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে জোশীমঠ ক্লাস্টারে বছরে ৪০-৫০ কুইন্টাল উচ্চগুণযুক্ত গোলাপজল তৈরি হচ্ছে। এখানকার মহিলা কৃষকেরা গোলাপ ফুল থেকে তেল তৈরি শুরু করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, জোশীমঠ ক্লাস্টারের এই সফল প্রয়োগ রাজ্যের অন্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

জোশীমঠ ক্লাস্টারের মহিলারা গত বছর থেকে গোলাপের তেল বানানো শুরু করেছেন। ২১ জুন, ২০১৮-তে যোগদিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেরাদুনে আসেন, তখন তাঁকে ওই মহিলা কৃষকদের তৈরি গোলাপজল উপহার হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ওই এলাকার ওইসব মহিলাদের প্রয়াসের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের উৎসাহিত করেন।

সম্পূর্ণ একটি নতুন অথচ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার মনোবল ওই গ্রামীণ পার্বত্য মহিলারা দেখিয়েছেন। পরিশ্রম করেছেন। আজ তাঁরা সফল। আজ তাঁরা ওই অঞ্চলের কৃষকদের পথপ্রদর্শক। পাহাড়ে কৃষিকাজ করা খুবই কঠিন। সেজন্য ওইসব এলাকার স্থানীয় মানুষজন বাড়ি-ঘর, কৃষিকাজ ছেড়ে শহরাভিমুখী হয়। এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু যোশীমঠ ক্লাস্টারের মহিলাদের এই সফলতার কাহিনি তাদের জীবনে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। কৃষিকাজ, বাড়ি-ঘর পরিত্যাগ করার পরিবর্তে, তাঁরা পুনরায় পারম্পরিক 'ক্ষেতি-বাড়িতে' মনোনিবেশ করবেন, যার বাউন্ডারি ফসল হিসেবে থাকবে গোলাপ। গোলাপী মহিলাদের অভিনন্দন! ■

# কোলেস্টেরল সারাতে হোমিওপ্যাথি

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

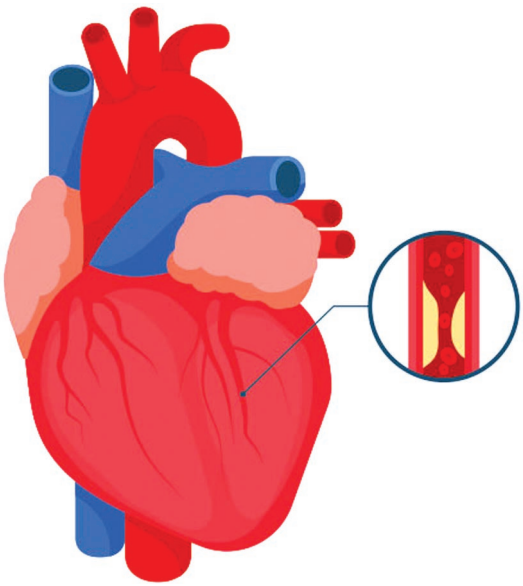

আধুনিক জীবন যাপনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের বিপদ। জ্যাঙ্কফুড, তেল, মশলাযুক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হার্টের অসুস্থতা ও রক্তে কোলেস্টরলের পরিমাণ বৃদ্ধি বিশেষ সম্পর্কযুক্ত।

কোলেস্টেরল হচ্ছে এক ধরনের চর্বি। এটি দেখতে অনেকটা মোমের মতো নরম। মানবশরীরে দেহকোষের দেওয়ালে থাকে। আমরা যখন চর্বি জাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের লিভারে এই কোলেস্টরল তৈরি হয় এবং রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে আমাদের দেহে সমস্ত রক্তনালীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি হরমোন তৈরিতে, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো পরিপাকে ও ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে। যদি অধিক পরিমাণে চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া হয় তবে এই অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ধমনীর দেওয়ালে জমাট বেঁধে পাক তৈরি করে এবং রক্ত চলাচলে বাধা দেয়। ফলে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা।

প্রতিদিন মানুষ তিন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, যেমন—ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট। এই ৩টি উপাদানের মধ্যে ফ্যাট সর্বোচ্চ শক্তি দান করে (৯ ক্যালোরি/গ্রাম)। আমরা গড়ে প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম ফ্যাট, ১০০ গ্রাম প্রোটিন ও ১০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করি। ফ্যাট বা স্নেহ বা চর্বি জাতীয় দ্রব্যকে মানব দেহের শত্রু ভাবা হলেও দেহের গঠন ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে এর ভূমিকা অনন্য। ফ্যাট বা স্নেহ বা চর্বি জাতীয় দ্রব্যের কাজ হলো--

১. দেহ গঠনে সহায়তা করা। ২. গড়ন রক্ষা করা। ৩. দেহের প্রতিটি কোষে আবরণ তৈরি করা। ৪. দেহের নিয়মিত কাজে সহায়তা করা। ৫. দেহের খাদ্য ও শক্তি ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা। ৬. দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখা।

**স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পদার্থের ভূমিকা কি?**

স্নেহ জাতীয় পদার্থ দেহের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু পরিমাণে বেশি হলেই বিপর্যয় ঘটে। দেহ খাদ্যের মাধ্যমে যে স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করে তা খরচ করায় বৈষম্য হলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। গড়ে আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য খাই তার মধ্যে ১৫ শতাংশ ফ্যাট থাকে। এই ফ্যাট খাদ্যনালীতে বিপাকের পর এবং রক্ত সংশোধনের পর লিভারে যায়। লিভারে কিছু পরিবর্তনের পর আবার রক্তনালী দিয়ে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে যায়। দেহের সব চর্বি বা কোলেস্টরল আমরা খাবারের মাধ্যমে পাই না।

**কোলেস্টেরল দু' ধরনের :**

**এইচডিএল :** একটি হাইডেনসিটি লাইপো প্রোটিন অর্থাৎ এইচডিএল। অন্যটি লো-ডেনসিটি লাইপো প্রোটিন অর্থাৎ এলডিএল। এইচডিএল ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এলডিএল কোলেস্টেরল সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। শরীরের অতিরিক্ত কোলেস্টেরলকে ধরে ধরে লিভারে নিয়ে যায়। লিভারে গিয়ে কোলেস্টেরল ভেঙে যায়। এইচডিএলের পরিমাণ যত বেশি হৃদরোগের ঝুঁকি তত কম। অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তনালীতে জমে জমে প্লাক তৈরি করে। এই প্লাক পর্যায়ক্রমে রক্তনালীকে বন্ধ করে দেয়। তখন হার্ট অ্যাটাক হয়। তাই হার্ট অ্যাটাকের মতো জটিল ও জীবন সংহারী অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে এলডিএল কমাতে হবে। সুতরাং এটা খারাপ কোলেস্টেরল।

**কোলেস্টেরলের উৎস :** প্রাণীদেহ ছাড়া অন্য কোথাও কোলেস্টেরল তৈরি হতে পারে না। আমাদের দেহের মধ্যে যতটুকু কোলেস্টরল আছে তার ৭০ শতাংশ অলিভার থেকে আসে, বাকি ৩০ শতাংশ অন্যান্য প্রাণীজ উৎস (মাছ, মাংস, ডিম, লিভার, মগজ, ইত্যাদি) থেকে আসে। কোলেস্টেরলের কারণে কী জটিলতা হতে পারে : অতিরিক্ত এলডিএল বা কম এইচডিএল বা ট্রাইগ্লিসারাইড থাকলে কিছু জটিল রোগ হতে পারে। আবার কিছু রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। যেমন— ১. ইসকোমিক হার্ট ডিজিজ (আইএইচডি) বা বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ। ২. স্ট্রোক। ৩.উচ্চ রক্তচাপ। ৪.কিডনি ফেইলিওর। ৫. শ্বাসকষ্ট। ৬. সন্তানহীনতা ইত্যাদি।

**কেলেস্টরলের ঝুঁকি কমাতে যে ধরনের খাদ্য খেতে হবে :** এক্ষেত্রে জলপাই তেল ও জলপাইয়ের তৈরি খাবার খুব উপকারী। যা খেলে শরীরে ভালো কোলেস্টরল বাড়ে। এতে রয়েছে মনো- অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন ই। শুকনো সোয়া প্রোডাক্ট, মটরশুটি জাতীয় খাবার শরীরের খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। শিম জাতীয় ওয়ালনাট, জলপাইয়ের মধ্যে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। সব ধরনের সবজি ও ফল খারাপ কোলেস্টেরলে মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যেসব সবজিতে ভিটামিন সি ও বিটা ক্যারোটিন রয়েছে, যেগুলো বেশি করে খেতে হবে। যেমন— কমলালেবু, আঙুর, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, পেয়ারা, আম, কাঁঠাল। এছাড়া বাঁধাকপি, ব্রকলিও ভিটামিন সি'র ভালো উৎস। কুমড়ো, কাঠবাদাম, গাজর, ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন। রসুন, পেঁয়াজ শরীরে বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমায় ও হার্ট ভালো রাখে। রুটি, লাল চাউল, লাল গম, আটা ভুট্টা ওটমিলে রয়েছে হাই সলিউবল ফাইবার। এই খাবার শরীরে ভালো কোলেস্টেরল তৈরিতে সাহায্য করে থাকে।

# বাংলাদেশি ক্রিমিনালদের দিয়ে কোচবিহারে তৃণমূল হার্মাদরাজ

**সাধনকুমার পাল**

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গে একটিও আসন পায়নি। পাহাড় ও সমতল চষে বেড়িয়ে দেদার প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে, উন্নয়ন বোর্ড গড়ে ছোট ছোট জনগোষ্ঠীগুলিকে বিভাজিত করে, চরম সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেও মমতা ব্যানার্জিকে উত্তরবঙ্গ থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। নির্বাচনের পরে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জনরোষের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন। স্থানীয় নেতারা তো দূরের কথা সুব্রত বক্সির মতো রাজ্য নেতারাও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়েও অনেক এলাকায় প্রবেশ করতে পারেননি। প্রহসনের ভোটে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সদস্যরা জনরোষের ভয়ে আশ্রয় নিতে থাকেন পদ্ম শিবিরে। পদ্ম শিবির জন পরিষেবা চালু রাখার জন্য হোক কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য হোক অনেক জায়গাতেই এই জনপ্রতিনিধিদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে পার্টিতে বরণ করে নেয়। ফলে লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বিজেপিতে বাড়তে থাকে রং পরিবর্তন করা নবাগত মানুষের সংখ্যাও।

পার্টিতে নবাগতদের ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছিল বিজেপি নেতাদের। আমজনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠে, দল যেভাবে বাড়ছে তাতে বিজেপির একটি ছাঁকনির প্রয়োজন। এই জোয়ারের মধ্যে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের মার্কামারা জেহাদি হার্মাদরা বিজেপির ছাকনিতে আটকা পড়েছিল। উত্তরবঙ্গে এই জেহাদিদের দিয়েই এখন তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাড়ানোর চেষ্টা করছে। ফলস্বরুপ এখন কোচবিহার হয়ে উঠেছে রণক্ষেত্র। গত একমাস ধরে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা থেকে সংঘর্ষের খবর আসছে। তৃণমূলের পতাকা দিয়ে মুখবাঁধা হার্মাদরা মোটর সাইকেল নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোচবিহার জেলার সর্বত্র। সন্ধ্যের পর অনেক জায়গাতে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিপদের আশঙ্কায় মানুষ নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখছেন। শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় প্রকাশ্য দিবালোকে মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ, দিনহাটার মতো শহরেও এদের দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। বিজেপির কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচী দেখলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রকাশ্যে বোমাবাজি করছে, গুলি ছুড়ছে। পুলিশ নির্বিকার। অনেক জায়গাতে পুলিশ প্রকাশ্যে হার্মাদদের সাহায্য




করার জন্য এগিয়ে আসছে। এদের নিশানা থেকে বাদ যাচ্ছে না রক্তদান শিবিরও।

গত ১৬ আগস্ট কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে বিজেপির শ্রমিক শাখা স্থানীয় ঝংকার ক্লাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। তখন বেলা আড়াইটে। রক্তদাতারা রক্তদানে ব্যস্ত। কেউ রক্তদিয়ে বসে বিশ্রাম করছেন, আবার কেউ রক্ত দিচ্ছেন। ক্লাব থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে চারটি স্কুল। সবকটিতে পঠনপাঠন চলছিল পুরোদমে। প্রতিদিনের মতোই মাথাভাঙ্গা শহরে জনতার ভিড়ে জমজমাট পরিবেশ। এমন সময় হঠাই করে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা দিয়ে মুখ বাঁধা এক দল সশস্ত্র হার্মাদ ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তদান শিবিরের উপরে। ক্লাবের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা রক্তদাতাদের মোটর সাইকেলগুলি লোহার রডদিয়ে পিটিয়ে ভাঙতে শুরু করে। একই সঙ্গে চলতে থাকে রক্তদান শিবির তছনছ করার প্রক্রিয়া। আক্রান্ত হন রক্ত নিতে আসা ডাক্তার-নার্সরা, বাদ যাননি বিছানায় ওয়ে থাকা রক্তদাতারাও। যে যেদিকে পারেন ছুটে পালাতে শুরু করেন। সংগৃহীত রক্ত পড়ে থাকে ক্লাব ঘরের মেঝেতে। ছুটে আসে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখলো আক্রমণ কারীদের কিছুই হলো না। আক্রান্তরা অনেকেই পুলিশের লাঠি খেয়ে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হলেন। এই ভরদুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে হার্মাদরা সর্বসমক্ষে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে, বোমা নিক্ষেপ করে। অবশেষে শহরের বুকে সশস্ত্র মিছিল করে। আতঙ্কিত মানুষ ছুটতে শুরু করে, স্কুলগুলি গেট বন্ধ করে বাচ্চাদের আটকে রাখে। মাথাভাঙ্গাবাসী হতভম্ব হয়ে পড়েন। কারণ এর আগে মাথাভাঙ্গার ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা কেউ মনে করতে পারেননি। মানুষ বলাবলি করছিল বাংলাদেশের অপরাধীদের নাকি নিয়ে আসা হয়েছে রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য।

কোচবিহার জেলার সিতাই শীতলখুচি, দিনহাটা, দেওয়ানহাট, ভেটাগুড়ি সর্বত্রই অচেনা সশস্ত্র যুবকরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রয়োজনমতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিজেপির কর্মসূচির উপর। প্রশাসন নির্বিকার। জেলা জুড়ে গুঞ্জন বিভিন্ন এলাকায় গুঞ্জন, বাংলাদেশি গুন্ডাদের নাকি তৃণমূল এলাকা দখলের কাজে লাগাচ্ছে। জনগণ নয় হার্মাদ বাহিনীই এখন তৃণমূলের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। জনভিত্তি না থাকলেও হার্মাদ বাহিনী ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু কিছু আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছে। এই লোকসভা নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এই দল বদল আর প্রতিদিনের জামা কাপড় বদল সমার্থক হয়ে দাড়িয়েছে। এ যেন এক চরম রাজনৈতিক মূল্যবোধহীনতা। বিজেপিকেও এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। মানুষ চাইছে দলবদলুদের দিয়ে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলের পথ থেকে বিজেপি সরে আসুক। মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে, আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধদের দিয়ে দল চালাক। না হলে বাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের গড়ে তোলা রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে বিজেপির নীচুস্তরের কর্মীদের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ■



# প্রশান্ত কিশোরের ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি ডাহা ফেল

## এবার নয়া স্লোগান হোক ‘হরি বলো, সঙ্গে চলো’

**সুজিত রায়**

পোল স্ট্র্যাটেজিস্ট, বাংলায় যাকে বলে নির্বাচন কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোর মহা ফাঁপরে পড়েছেন। সেই প্রশান্ত কিশোর যিনি ‘বাঘা বিনাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে তাঁর নির্বাচনী প্রচার কৌশলে রাতারাতি ‘জাতীয়তাবাদী বিকাশ পুরুষ’-এ পরিণত করেছিলেন। সেই প্রশান্ত কিশোর যিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে প্রায় সর্বস্ব হারানো গুপ্তধন খুঁজে দেবার মতো করে বিহার প্রশাসনের সর্বোচ্চ চেয়ারটি হাতে করে তুলে দিয়েছেন। যিনি পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক দাবার বোর্ডে বোড়ে দিয়েই কিস্তিমাত করেছেন স্বচ্ছন্দে। যাঁর সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির বার্ষিক টার্নওভার কয়েক হাজার কোটি টাকা। যে সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের মাসিক মাহিনার অঙ্ক শুনলে চোখ কপালে ওঠে এবং যে সংস্থার অফিস ছড়িয়ে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। তিনিই এখন পশ্চিমবঙ্গে এসে ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’ বলে পরিত্রাহী চীৎকার করছেন বলে তাঁরই ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা যাচ্ছে। কারণটা কী? কারণ একটাই। পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষের রাজত্বে নাকি তাঁর আবিষ্কৃত কোনও কৌশলই কাজে লাগছে না। দিদির গত আট বছরের মহিমান্বিত প্রশাসনিক এবং সামাজিক ভূমিকার ফলশ্রুতি হিসেবে সব কৌশলই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে তৃণমূলের আখড়ায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে প্রশান্ত কিশোরের বহু-চিন্তিত সব কৌশলই ‘শুধুই চমক এবং শুধুই সস্তার রাজনীতি’ ছাড়া আর কিছুই বলে প্রতিভাত হচ্ছে না।

২০১১ সালে ৩৪ বছরের প্রবল প্রতাপান্বিত বামফ্রন্টকে কবরে পাঠিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একক ক্যারিশমায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার ২-৪ সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল— রাজ্যে সরকারের কাজ শুরু হয়েছে বেশ জমজমাট একটা নাটক দিয়ে। যেমন সাতসকালেই হাসপাতালে হাসপাতালে দিদির হাজিরা। দু’চার দিন স্বস্তির হাওয়া। তারপর যে কে সেই। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক সভা। কোটি কোটি টাকা খরচ করে হম্বিতম্বি। কিন্তু সিন্ডিকেট রাজ, তৃণমূলি মস্তানি, দাঙ্গা, দিনেদুপুরে সাধারণ মানুষের ঘরে লুটপাট, ধর্ষণ বন্ধ হয়নি কিছুই। যাদবপুরের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে জেলে ভরে, কামদুনির টুম্পা কয়ালদের ‘নকশাল’ বলে, ঝাড়গ্রামের শিলাদিত্যকে ‘মাওবাদী’ বলে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রীকে ‘মাওয়িস্ট’ বলে তার চোখের জল ঝরিয়ে দিদি যখন ফুলন-রানির মতো সাম্রাজ্য পেতে বসেছেন, মানুষ ততদিনে বুঝে গেছে—পশ্চিমবঙ্গবাসীর কপাল পুড়েছে।

মুখ নয়, মুখোশে ভরে গেছে মা-মাটি-মানুষের বাঙ্গলা। এও বাহ্য। দিদির সবচেয়ে বড়ো নাটকের পর্দাটা ফাঁস হয়ে গেল ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে যখন প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করে ছিলেন— বাঙ্গলা হবে বিরোধীমুক্ত। নির্বিচারে রাজনৈতিক আক্রমণ, নির্বিচারে নির্বাচন পদপ্রার্থীদের হত্যা, হুমকি, শাসানির যে পরিবর্তিত অধ্যায় মানুষ প্রত্যক্ষ করল, তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল— রাজ্যে প্রশাসনটা নেই। আছে যা তা শুধু সংকীর্ণ রাজনীতি। ফলটা হাতেনাতে পেল তৃণমূল ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে। টনক নড়ল দিদির। ডাক পড়ল সেই প্রশান্ত কিশোরের। পিসি-ভাইপো মিলে দরজা বন্ধ করে প্রশান্ত কিশোরের হাতে নাকি ৫০০ কোটি টাকা গুঁজে দিয়ে 'প্রশান্তভাই বাঁচাও' বলে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন।

তা প্রশান্তের প্রশান্তিতে অশান্ত দিদি একটু শান্ত হয়েছেন বটে। বড়ো বড়ো করে চোখ পাকিয়ে কথা বলছেন না। প্রধানমন্ত্রীকে তুইতোকারি করে গালাগাল দিচ্ছেন না। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে মাটির দাওয়ায় বসে গ্রাম্যবধূদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন, কালো চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, ডিব্বা ভর্তি লজেন্স বিলি করছেন, শিশুদের আদর করছেন, কোলে নিচ্ছেন। সবই ভালো কথা। কিন্তু, তাঁতেও চিঁড়ে ভিজবে না। কারণ ওই কাটমানি রহস্য। প্রসঙ্গটা তুলে দিলেন দিদি নিজেই। দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। সরকারি অফিসার, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। ঘনিষ্ঠ দলীয় নেতা, বিধায়ক, সাংসদদের বিরুদ্ধে। ভেবেছিলেন--- এসব চমক দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুব্ধ মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি ফিরে যাবেন পুরনো 'ঘরের মেয়ে'র পরিচয়ে। হয়নি। কারণ কাটমানি কত নেওয়া হয়েছিল, তা যেমন পরিস্ফুট হয়নি, কত ফেরত এল, তাও জানা যায়নি। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন দিদির কথা মতোই কাটমানির ৭৫ ভাগ কোথায় জমা পড়ল, কার কোষাগারে, সেটাও 'গুপ্তধন' হয়েই রইল। প্রশান্ত কিশোরের কৌশল ডাহা ফেল করে গেল। ফের নতুন কৌশল 'দিদিকে বলো।' গোটা রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার ফ্লেক্স— 'দিদিকে বলো'। সরাসরি ফোন দিদিকে। নম্বর ৯১৩৭০৯১৩৭০। প্রথম দিনেই ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ অভিযোগ। সার্ভার ডাউন। দ্বিতীয় দিন থেকে ফোন বেজে যায়। কেউ তোলে না। প্রায় একমাস কেটে গেছে। কত অভিযোগ জমা পড়ল? দিদি তার কতগুলোর সমাধান করলেন? না, হিসাব দেবার দায় কেউ নেয়নি। না সরকার। না দল। ফের ডাহা ফেল প্রশান্ত কিশোর।

এবার নতুন কৌশল। দলীয় নেতাদের নির্দেশ— জনসংযোগ বাড়াও। গ্রামে গ্রামে যাও। গরিব মানুষের ঘরে রাত কাটাও। পাত পেড়ে খাও, মেঝেয় শুয়ে ঘুমোও। মাথায় হাত নেতাদের। এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে সুখশয্যায় ঘুমোনোর অভ্যাস যে! বাধ্য হয়ে কেউ কেউ গেলেন। গেঞ্জি লুঙি পরে ছবিও তোলালেন পোষ্য চিত্র সাংবাদিকদের দিয়ে। পোষ্য সংবাদপত্রে তা ঢালাও করে ছাপাও হলো। কিন্তু মানুষ মুচকি হাসল। মুখ বেঁকিয়ে বলল— যত্ত সব ভড়ং! জনসংযোগ কর্মসূচি জলে। এখন স্বয়ং দিদিই নেমেছেন দলের হয়ে জনসংযোগ করতে। মুখ্যমন্ত্রী কাম দলনেত্রী-কাম-পাবলিক রিলেশনস অফিসার। লোকের হাসি আর থামছে না। দিদির চমকের রাজনীতির চোটে গমকে গমকে উঠছে হাসির ঢেউ গোটা রাজ্য জুড়ে। জাতহীন, বর্ণহীন, ধর্মহীন সেই হাসির ঢেউয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি, সমাজনীতিও। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে এত বড়ো রসসৃষ্টি কেউ করতে পারেননি। বোধহয় স্বয়ং শিব্রাম চকরবরতিও নয়।

একটা লাভ অবশ্য হয়েছে। 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'দের মুখে পশ্চিমবঙ্গের দিদি আর তার ভাই প্রশান্ত হাসি ফোটাতে পেরেছে। বামফ্রন্টের ৩৫ আর তৃণমূলের ৯— টানা ৪২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বড়ো কষ্টে আছে। কষ্ট এতটাই যে মানুষ হাসতে ভুলে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত রাজনীতিতে শাসকদলের এই হাস্যরসসমৃদ্ধ রাজনৈতিক নাট্যচর্চা মানুষের মুখে অন্তত একটু হাসি ফোটাতে পেরেছে। পেটে ভাত, হাতে কাজ থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রশান্ত কিশোর--- এবার আপনার কৌশল কী? থেমে গেলে তো চলবে না। ৫০০ কোটি! সে তো অনেক টাকা। এত ছেলে-মেয়েকে চাকরি দিলেন। সহজে তো তাড়াতেও পারবেন না। তাহলে এবার কী নয়া স্লোগান? 'দিদিকে বলো' তো ফেল! এবার বরং ফ্লেক্স ছাড়ুন— 'হরি বলো সঙ্গে চলো'। ২০২১ তো আর বেশি দেরি নেই।




**দিদির চমকের রাজনীতির চোটে গমকে গমকে উঠছে হাসির ঢেউ গোটা রাজ্য জুড়ে। জাতহীন, বর্ণহীন, ধর্মহীন সেই হাসির ঢেউয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি, সমাজনীতিও। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে এত বড়ো রসসৃষ্টি অতীতে কেউ করতে পারেননি।**

# নিজেকে বাঁচাতে দলের কর্মীদের বলির পাঁঠা করছেন মমতা

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

একদা, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নুরুল ইসলাম আমাকে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, 'মমতা বিপদে পড়লে ওর পরিবারকেও অস্বীকার করতে পারে। এটাই ওর বৈশিষ্ট্য। আসলে কৃতজ্ঞতা নামক শব্দটিই মমতার অভিধানে নেই।' নুরুল সাহেব যখন আমাকে একথা বলেছিলেন, তখন মমতা বিরোধী নেত্রী। এমনকী কংগ্রেসও ছাড়েননি। কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মমতা কংগ্রেস ছাড়বেন, ছেড়ে স্বতন্ত্র একটি দল করবেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হবেন— এরকম ভাবনা তখনও কেউ ভাবেননি। কিন্তু তখনই নুরুল ইসলাম এমন একটি অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী মমতা সম্পর্কে করেছিলেন। সাংবাদিক জীবনে মমতার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ফলত, অত্যন্ত নিকট থেকে তাঁর রাজনৈতিক কৌশল এবং রাজনীতির ধরন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে মমতাকে দেখার সুবাদে এটুকু অন্তত বলতে পারি, নুরুল ইসলাম একেবারে ভুল কিছু বলেননি। বরং, মমতা সম্পর্কে নুরুল সাহেবের এই মূল্যায়ন অনেকটাই সঠিক। কৃতজ্ঞতা শব্দটি যে মমতার অভিধানে নেই, তা বুঝতে পেরেছি সাংবাদিক হিসাবেই বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। যেমন প্রয়াত পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে। যে সময় কংগ্রেসের কোনো নেতা মমতার পাশে এসে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেননি— সেই সময় হাতে গোনা যে দু-একজন প্রথম সারির নেতা মমতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর দুজনের নাম অবশ্যই স্মর্তব্য— পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পরে বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতাও হয়েছিলেন পঙ্কজবাবু। ভদ্র, সজ্জন এবং সৎ এই মানুষটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মমতার কাছ থেকে প্রাপ্য শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাননি। বরং দুর্দিনের বন্ধু এই মানুষটিকে মমতা শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং অসম্মান করেছেন। ক্ষুব্ধ, অপমানিত পঙ্কজবাবু প্রকাশ্যে একটি কথাও বলেননি, বরং নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন রাজনীতি থেকে।

মনে আছে, রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কিছুদিন আগে পঙ্কজবাবুর সঙ্গে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল আমার। একথা সেকথার পর দুঃখ করে বলেছিলেন— 'মমতা আমাকে অপমানটা না করলেই পারত।' কাছে থেকে দেখতে দেখতে বুঝেছি, আসলে এটাই মমতার চরিত্র। স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেলে মমতা উপকারীকে ভুলে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। যেমন, ফেলানি বসাক। হতভাগ্য এই মূক বধির কিশোরীটিকে কিছু দুষ্কৃতী ধর্ষণ করেছিল। মমতা এই কিশোরীটিকে নিয়ে মহাকরণে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরের সামনে ধরনায় বসেন। পুলিশ জোর করে ওখান থেকে মমতাকে উঠিয়ে লালবাজারের লক আপে আটক করে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবে তখন যথেষ্ট শোরগোল পড়ে যায়। রাজনৈতিকভাবে মমতা অনেকখানি প্রচারও পান। কিন্তু ওই হতভাগিনী ফেলানি বসাকের কী হয়েছিল? রাজনৈতিক প্রয়োজনটি মিটে যাওয়ার পর মমতা আর ফেলানির দিকে ফিরেও তাকাননি। ফেলানি আর তার হতদরিদ্র বিধবা মা কয়েকদিন সাহায্যের আশায় মমতার কালীঘাটের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। অবজ্ঞা ছাড়া কিছুই জোটেনি তাদের কপালে। পরে ফেলানি এবং ফেলানির মা দুজনেই মারা যান। দুঃসময়ের সঙ্গীদের এইভাবে অবজ্ঞা করা এবং অপমান করার এইরকম বহুবিধ ঘটনার এক অন্যতম সাক্ষী মুকুল রায়। বর্তমানে বিজেপি নেতা মুকুলবাবু মুখ খুললে মমতা চরিত্রের অনেক রহস্যই এভাবে উদ্ঘাটন হতে বাধ্য।

কিন্তু বিপদে পড়লে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিজে বাঁচতে অন্যকে বলির পাঁঠা করতে পারেন— সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা হলো এবার। কীভাবে হলো? এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে। এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ— গত সাত বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ। তোলাবাজি ও কাটমানিতে অতিষ্ঠ মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিষয়টি বোঝেননি তা নয়। বুঝেছেন বলেই, সভায় সভায় তিনি কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। চারশো কোটি টাকার বিনিময়ে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোর তাঁকে এই পরামর্শ দিয়ে গেছেন কিনা জানি না। যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে, প্রশান্ত কিশোর মমতার প্রকৃত বন্ধু নন। কিন্তু মমতার এই কাটমানি ফেরত দেওয়ার আহ্বানের ফলে কী হলো? দেখা গেল, জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মেজো, সেজো, ছোটো নেতাদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভের মুখে কেউ কেউ টাকা ফেরত দিচ্ছেন, কেউ কেউ টাকা না দিতে পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার মমতা এবং মমতা ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ বিক্ষোভ হচ্ছে না। এখানেই মমতার রাজনীতিটা লক্ষ্য করার মতো। মমতা জানেন, একমাত্র এই লাগামছাড়া দুর্নীতির অভিযোগই ক্ষমতা থেকে তার দলকে অপসারিত করতে পারে। এতদিন ধরে তিনি যে সৎ সাজার মিথ্যা ভানটি করে রয়েছেন তা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কাজেই দুর্নীতির অভিযোগে বিপর্যয়ের আঁচ পেতেই মমতা বন্দুকের নলটি একনিমেষে ঘুরিয়ে দিয়েছেন নীচুতলার কর্মীদের দিকে। 'কাটমানি ফেরত দাও, কাটমানি ফেরত দাও' বলে হইচই ফেলে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, এই দলটিতে তিনিই একমাত্র সৎ। তিনি কোনো অন্যায় করেননি। যা অন্যায় করেছেন দলের নীচুতলার নেতারা। অথচ এই মমতাই নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীসভায় বলেছিলেন, '৭৫ শতাংশ পার্টিকে দিয়ে বাকি ২৫ শতাংশ নিজের কাছে রাখো।' অবশ্য নিজে ধোয়া তুলসীপাতা সাজতে গিয়ে বন্দুক অন্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার খেলা মমতা আগেও খেলেছেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীর নামে যখন নারদের স্টিং অপারেশনে টাকা নেওয়ার ছবি




দেখানো হয়েছে, তখনও মমতা বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় বলে বেড়িয়েছেন— 'আগে জানলে এদের টিকিট দিতাম না।' তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায়, সুব্রতবাবু একান্তে কয়েকজনকে বলেছিলেন, 'মমতা আমাদের বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজে ভালো সাজতে চাইছেন।' আমি একবারও বলতে চাইছি না— জেলায় জেলায় যেসব তৃণমূল নেতারা কাটমানি খেয়েছেন বা টিভির ক্যামেরায় নারদ স্টিং অপারেশনে যেসব তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীকে হাত পেতে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে তারা ধোয়া তুলসীপাতা। আমার বক্তব্য সহজ— বন্দুকটা শুধু এদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মমতা আসলে কী আড়াল করতে চাইছেন?

সাত বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই সাত বছর ধরে এই রাজ্যে অজস্র তোলাবাজি আর কাটমানি খাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে যথেষ্ট শোরগোলও হয়েছে। বেশ কিছু শিল্পসংস্থা তোলাবাজির জেরে এই রাজ্য থেকে পাট গুটিয়েছে। আজ যদি মমতা হঠাৎ ভিনগ্রহ থেকে এসে অবাক হওয়ার ভান করেন— তাহলে মানুষের ভুরু কোঁচকাবেই। নীচু তলার যে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা কাটমানি খেয়েছেন, তাদের কাটমানি ফেরত দিতে হবে অবশ্যই। কিন্তু মমতার অতি ঘনিষ্ঠ যে ব্যক্তিটি প্রতি মাসে তেরোটি গাড়ির কনভয় নিয়ে পুরুলিয়া থেকে তোলার টাকা আদায় করে কলকাতায় ফেরেন— তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা এবার নেবেন মমতা? ওই তোলার টাকা তাঁকে ফেরত দেওয়ার কথা বলতে পারবেন তো? বন্দর অঞ্চলে মমতার অতি ঘনিষ্ঠ যে নেতাটিকে সেলামি না দিলে মাল খালাসের বরাত পাওয়া যায় না— তাকে কাটমানি ফেরত দিতে বলতে পারবেন তো মমতা? কালীঘাটের যে পরিবার মাত্র সাত বছরেই এক হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সেই পরিবারের অনেক সদস্যের বিরুদ্ধেই তোলাবাজি এবং কাটমানির অভিযোগ রয়েছে। ব্যবস্থা নিতে পারবেন তো মমতা তাদের বিরুদ্ধে? ডেলোর বাংলোয় সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তাঁর কী আলোচনা হয়েছিল— প্রকাশ্যে তা জানানোর সৎসাহস আছে তো মমতার? একটি চিট ফান্ড মালিকের মালিকানাধীন টিভি চ্যানেলকে বাঁচাতে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা ঢেলেছেন কেন মমতা— কী তার স্বার্থ? বিরোধী নেত্রী থাকার সময়ও মমতা ছবি আঁকতেন। সে ছবি কখনো পাঁচ টাকাতেও বিকাতো না। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই সে সব ছবি কোটি কোটি টাকায় বিকোতে শুরু করল? কাদের প্ররোচনায় বা আদেশে কারা ছবি কেনার নাম করে টাকা ঢালতে শুরু করল তৃণমূলের শিকড়ে— সে নিয়েই বা তদন্ত হবে না কেন?

আসলে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করাটা মমতার উদ্দেশ্য নয়। মমতার উদ্দেশ্য, নিজেকে এবং নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যাবতীয় অভিযোগ থেকে আড়াল করা। যে কারণেই কাটমানি ফেরত দেওয়ার গিমিকটা তাঁর কাছে এখন সবিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

আমার মনে আছে, মমতা যখন বিরোধী নেত্রী, তখন একবার কলকাতার ধর্মতলায় আয়কর ভবনে মমতার সঙ্গীসাথীরা হামলা চালায়। মমতার নির্দেশেই ওই হামলাটি চলেছিল সেটা আমি জানি। হামলার কারণ ছিল, সেই সময় আয়করের এক পদস্থ কর্তা সি কে ইজং মমতার কোনো একটা অন্যায় আবদার মেটাতে চাননি। সেই ক্ষোভেই এই হামলা। ওই ঘটনার পর সি কে ইজংয়ের একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম আমি। ইজং সাক্ষাৎকার দিতে চাননি। কিন্তু একান্ত আলোচনায় দুঃখ করে বলেছিলেন, যিনি নিজের স্বার্থে এরকম একটা কাজ করতে পারেন, তিনি যে কোনো সময় যা খুশি তাই করতে পারেন।

নিজেকে আড়াল করতে বন্দুকের নলটা আজকে দলীয় সহকর্মীদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন মমতা। তারা অন্তত বুঝতে পারছেন, তাদের নেত্রী আর যাই হোন, ভরসাযোগ্য নন।

# আইসিসিআর-এর অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ভারতবর্ষের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১ম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কলকাতার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেন্টারের সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহের এই অনুষ্ঠানে




প্রধান অতিথি রূপে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং বিশেষ অতিথি রূপে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ও আইসিসিআর-এর প্রেসিডেন্ট তথা লোকসভার সাংসদ ড. বিনয় সহস্রবুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। উপরাষ্ট্রপতি শ্রীনাইডু এদিন প্রয়াত বাজপেয়ীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর রচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে মহান দেশের মহান সন্তান বলে উল্লেখ করে বলেন অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর গ্রামে তরুণ বয়সে বাজপেয়ীজীর কোনো সভা থাকলে টাঙায় মাইক নিয়ে ঘোষণা করতেন। বাজপেয়ীজীকে অজাতশত্রু আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যেদিন বিজেপির সভাপতি হিসেবে বাজপেয়ীজীর পাশে বসার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল সেই দিনটি তাঁর জীবনে অন্যতম সেরা দিন। মূল বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে তিনি বিশ্বের এক ষষ্ঠমাংশ জনসংখ্যার ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য হতে কেন এত বেগ পেতে হচ্ছে তা নিয়ে আক্ষেপ করেন। তরুণদের জন্য তাঁর উপদেশ—'ইনস্ট্যান্ট ফুড মিনস কনস্ট্যান্ট ডিজিজ' শুনে উপচে পড়া প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল ওঠে। অনুষ্ঠানে বাজপেয়ীজীর চিত্রনির্মাতা থেকে শুরু করে নানাক্ষেত্রের কৃতীদের উপরাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বন্দে মাতরম্ গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

# চাঁচোলে পরিবার প্রবোধনের মাতৃসম্মেলন

গত ১৭ আগস্ট মালদা জেলার চাঁচোলে উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে মাতৃ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী রূপে উপস্থিত



ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর বারদুয়ারী উচ্চতর হাই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী মিলি বিশ্বাস। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবেধনের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন শ্রীমতী চন্দনা চট্টোপাধ্যায়।

# বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১১ আগস্ট বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় বেহালা গার্লস হাই স্কুলে। সমরেন্দ্রকুমার চন্দ্রের উদ্বোধনী সংগীত ও সমবেত বিবেকানন্দ-বন্দনা দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। গত এক বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠচক্রের হিসাব রক্ষক ২০১৮-১৯-এর আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে পাঠচক্রের নতুন সমিতি গঠিত হয়। উপদেষ্টা অমরকৃষ্ণ ভদ্র ও প্রীতীশ মণ্ডল তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন ঘোষ।





# দক্ষিণবঙ্গ ধর্মজাগরণ সমিতির রুদ্রাক্ষ মহাভিষেক যজ্ঞ

গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গ ধর্মজাগরণ সমিতির উদ্যোগে হাওড়া মহানগরের সালকিয়ায় কৃষ্ণ ভবনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয় রুদ্রাক্ষ মহাভিষেক যজ্ঞ। অনুষ্ঠানে রামরাজাতলার শ্রীশঙ্কর মঠের গুরুকুলের আচার্যের পৌরোহিত্যে ৭০ জোড়া দম্পতি অংশগ্রহণ করেন। যজ্ঞ চলাকালীন গুরুকুলের বিদ্যার্থীরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে এক সুন্দর পরিবেশ রচনা করেন। যজ্ঞ শেষে দম্পতিদের সামনে প্রবচন উপস্থাপন করেন মধ্যপ্রদেশের ধন্বন্তরী পীঠের পীঠাধীশ ১০০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী সুরেশ্বরানন্দ মহারাজ। রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি, তার আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা করে আদর্শ হিন্দু হওয়ার আবেদন সবার কাছে করেন। তার আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ননীগোপাল সিংহ। দম্পতিদের আশীর্বচন দান করেন শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ এবং বরানগরের মাতা শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের প্রধান পূজারি তথা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্মজাগরণ সমিতির প্রান্ত সংস্কৃতি প্রমুখ স্বামী ফুলদানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ বিনয় ভুঁইয়া, দুই বঙ্গের প্রমুখ করুণা প্রকাশজী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা-সহ বিবিধ সংগঠনের কার্যকর্তা ও মা-বোনেরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজেশজী।

# বেলুড়ে 'প্রজ্ঞাপ্রবাহ'-এর দক্ষিণবঙ্গ শাখা 'লোকপ্রজ্ঞা'র গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় প্রজ্ঞাপ্রবাহের দক্ষিণবঙ্গের শাখা লোকপ্রজ্ঞার পরিবেশনা ও ব্যবস্থাপনায় গত ৬ থেকে ৮ আগস্ট স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দুই শতাধিক প্রবুদ্ধজনের উপস্থিতিতে ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার প্রণীত 'অমর ভারত, অজেয় ভারত' গ্রন্থটি লোকার্পণ করেন বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুজ্যপাদ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। উপস্থিত সবাইকে স্বাগত এবং সম্ভাষণ জানান প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সকলকে সমৃদ্ধ করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক জগন্নাথ নন্দকুমার। স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ এক মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীসোনী 'অমর ভারত অজেয় ভারত' নামটির সুন্দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অমরত্ব ও অজেয়ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীনন্দকুমার ভারতবর্ষের প্রাচীন ও নবীন মনীষার ব্যাখ্যা করে প্রজ্ঞাপ্রবাহের লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করেন। দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের সম্পাদক কুশল চৌধুরী বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে মানুষের গ্রন্থপাঠের আগ্রহ কমে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট লেখক তথা গ্রন্থপ্রণেতা ড. সরকার উন্মোচিত গ্রন্থটির বিষয় সমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ পূজ্য স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের করকমলে গ্রন্থটি তুলে দেন লেখক ড. সরকার। উপস্থিত ছিলেন মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি পূজ্য স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ।



অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশ রচনা করেন অত্রি মল্লিক, সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র, কল্যাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সোমশুভ্র গুপ্ত।

# বারাসতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ আগস্ট স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে বারাসাত আদালত চত্বরে অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাখিবন্ধন পালন করা হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় আদালতের আইনজীবী তথা শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির কার্যকর্তা বিশ্বনাথ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগারণ মঞ্চের জেলা সংযোজক কৃষ্ণ দেবনাথ, প্রান্ত সংগঠত সুব্রত মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সহ সংযোজক শুভঙ্কর রায় ও অঞ্জন সমাদ্দার।




# বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য সেবা সংস্থা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে গত ১ জুলাই কলকাতার দমদম রোড মিত্র বাগানে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১৩৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ৬৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৪ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

৩ জুলাই হাওড়া জেলার আমতা রামচন্দ্রপুর শিবিরে ১৫৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ১০৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৮৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

১১ আগস্ট হুগলী জেলার ভূমেরা গ্রামে ৬৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ১২৭ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১০১ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

১৫ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট-গোপালপুরে ১০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ৬৮ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৪৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

# বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী, লেখক গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সহায়তায় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় বিজ্ঞান প্রসার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের অধিকর্তা ড. নকুল পরাসর। উপস্থিত ছিলেন বসু প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তপন সাহা। বক্তারা গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের কর্মজীবন, জীব-বৈচিত্র্য-পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ, বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। জীববিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর স্নেহধন্য বিজ্ঞানী শ্রীভট্টাচার্য কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে অনেক অজানা তথ্য প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক পুস্তকে তা প্রাকাশিত হয়। তাঁর গবেষণাপত্র ২২ টি ভারতীয় এবং একাধিক বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় অসামান্য লেখনশৈলীর জন্যও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।









# নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

**অমিত ঘোষ দস্তিদার**

দুলে ওঠে কাশফুল, তার সেই নরম ঢেউঢেউ দোলা মাটির বুকে বিছিয়ে থাকা শিউলিকে স্পর্শ করে। পদ্মফুলের অঞ্জলি, ধূপ আর ধুনোর সুবাস এবং ঢাকের বাদ্যি হৃদয়ের উত্তাল আনন্দকে ব্যাং ছুড়াছুড়ি খেলার মতো ছড়িয়ে দেয় এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে। এই আনন্দ কারুর একার নয়, সবার। এ আনন্দে কোনো বাধা নেই, এ এক অবাধ আনন্দ। এ আনন্দ মানুষের আনন্দ, প্রকৃতির আনন্দ, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলনের আনন্দ। স্বর্গলোক এবং মর্ত্যলোক তাই সাজো সাজো রবে জেগে ওঠে। স্বর্গলোকের শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের ঘরের মেয়ে উমা এক পরম আত্মিক টানে তাঁর মর্ত্যলোকের বাপের বাড়িতে আসছেন—এমন আত্মীয়সুলভ ভাবনায় বিশ্বের সর্বত্র আনন্দ-নিনাদিত শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। মেয়ে, জামাই এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েদের আগমনে হিন্দুর সঙ্গে মেতে ওঠে অহিন্দুরাও। সেকুলার পন্থার জিগির তুলে যাঁরা সাহিত্য-রাজনীতি-শিল্প ইত্যাদি করেন তাঁরাও এই উৎসবে তাঁদের আখের গুছিয়ে নেন। ভারতবর্ষ হিন্দুদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, ধর্মভূমি, কর্মভূমি ও মোক্ষভূমি। অনেক হিন্দু আজ ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে ধর্মহীনতা বা ধর্মউদাসীনতায় গা ভাসাচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—তারাই আবার খুব বেশি বেশি করে ধুনুচি-নৃত্য করে ফেলেন শরৎকালের এই উৎসবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে মেতে ওঠেন আশ্বিনের শরতে দশভুজা মৃন্ময়ী মায়ের আবাহনে। মানুষের আবাহনে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপে প্রকাশিত হন। তিনি যে আমাদেরই জগজ্জননী মা দুর্গা।

দুর্গাদেবীর পূজা নিছক ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আনন্দ করা নয়; দেবীপূজার মূল তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আত্মশক্তির উদ্বোধন। উত্তরায়ণে বসন্তকালে দেবতারা জাগ্রত থাকেন। দক্ষিণায়নে শরৎকালে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। এই জন্য অকাল বোধন করে রামচন্দ্র দেবতাদের জাগিয়েছিলেন। দেবী দুর্গা সর্বগুণান্বিতা ও সর্বকারণের কারণ। দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত হলো দেবীতত্ত্বের বৈদিক ভিত্তি। ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌দেবী স্বীয় অচিন্ত্যনীয় মায়া মহিমা ও শক্তির কথা নিজমুখে ব্যক্ত করেন—এই বর্ণিত রূপভিত্তি হলো দেবীসূক্ত। দেবীর পাদপদ্মচরণ বন্দনাপূর্বক ধ্যান, আবাহন, প্রার্থনা ও স্বস্তিমূলক গীতবর্ণিত রূপভিত্তি হলো রাত্রিসূক্ত।

মহালয়ার পূর্বে পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদান ও তর্পণাদি শাস্ত্রমতে বিধেয় এবং পিতৃপক্ষ শেষে মহালয়া থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষের সূচনা। দুর্গাদেবী অষ্টশক্তি সমন্বয়ে পরিবেষ্টিতা হয়ে থাকেন। এই অষ্ট শক্তি হলো—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং অতিচণ্ডিকা।

'দুর্গ' শব্দটির অর্থ দৈত্য, যা কিছু খারাপ কাজ, সমস্ত রকমের শোক, নানাবিধ বিঘ্ন, ভবমায়ার বন্ধন, যাবতীয় দুঃখ, নরক যন্ত্রণা, যমদণ্ড, মহাভয়, অতিরোগ ইত্যাদি। 'দুর্গ' শব্দের সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে 'দুর্গা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'আ' প্রত্যয়টি হন্তৃবাচক, জীবের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ যিনি নাশ করেন তিনিই—দুর্গা।

তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে 'পূজা' বলা হয়, বৈদিক সংস্কৃতিতে তাকে 'যাগ' বা 'যজ্ঞ' বলা হয়। উভয়ের উদ্দেশ্য হলো মুক্তি, আর এই মুক্তি প্রাপ্তির উপায় হলো আত্মসমর্পণ। নিজেকে ঈশ্বর-চরণে পরিপূর্ণ রূপে সমর্পণ করাই হলো পূজা। পূজার মূল উপকরণ তিনটি—শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভাবনা। শ্রদ্ধা না থাকলে ভক্তির উদয় হয় না। 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ সত্য, সত্যার্থক শ্রৎ-কে ধারণ করাই শ্রদ্ধা। অচঞ্চল স্থির এবং দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। প্রকৃত শ্রদ্ধা থেকে আসে ভক্তি। একনিষ্ঠ অনুরাগই ভক্তি। আবাহন, সমর্পণ এবং বিসর্জনের অনুকূল অনুষ্ঠানই ভাবনা। শ্রীশ্রীদুর্গামাতা হলেন জাতি- মাতৃকা। তাঁর আরাধনা করার অর্থ জাতীয় জীবনে শক্তি-সাধনা। শক্তি, শান্তি ও মুক্তির অভয়বাণী নিয়ে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, ধনশক্তি, গণশক্তির মাতা শ্রীশ্রী দুর্গা সর্বশক্তিসমন্বিতা, সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতা।

দেবী উপনিষদে বলা হচ্ছে—তিনি দেব, দানব, মানবের অজ্ঞেয়, তাই তিনি 'অজ্ঞেয়া'। তাঁর অন্ত নেই বলে তিনি---'অনন্তা'। বাক্‌মনের অতীত বলে তিনি 'অলক্ষ্যা'। সর্বাধিক মঙ্গলপ্রদাত্রী বলে তিনি 'সর্বমঙ্গলা'। তিনি নারায়ণ শক্তিসম্ভূতা বলে তাঁকে বলা হয় 'নারায়ণী'। সকল ঐশ্বর্যের আধারভূতা 'ভগবতী'। পুণ্য তিথিপর্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 'পার্বতী'। তিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, শিবা, সর্বার্থসাধিকা, শরণ্যা, ন মম—আমার নয়,

তোমার—এই ভাবনায় সর্বস্ব সমর্পণ করাই হলো—প্রণাম। আমরা যদি তা করতে পারি তবেই তাঁর প্রতি প্রদেয় আমাদের প্রণাম সার্থক হয়ে উঠবে।

মেধস মুনির নির্দেশে বসন্তকালে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা সুরথ দুর্গাপূজা করে দুর্গতিমুক্ত হয়েছিলেন। শরৎকালে দুর্গা পূজার প্রচলন রামচন্দ্র করেছিলেন।

সকল দেবতার সুসংহত শক্তি ও প্রেরণা সম্মিলিত রূপ থেকে তৈরি দেবী দুর্গার দেহসৌষ্ঠব—দেবাদিদেবের তেজে তৈরি হলো তাঁর মুখমণ্ডল, যমের তেজে তৈরি হলো দেবী দুর্গার কেশদাম। বিষ্ণুর শক্তিতে তৈরি হলো দেবী দুর্গার বাহুসকল, চন্দ্রের তেজে তৈরি হলো দেবীর বক্ষ, ইন্দ্রের তেজে তৈরি হলো দেবীর শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে তৈরি হল দেবীর ঊরুদ্বয়, পৃথিবীর শক্তিতে দেবীর শরীরের নিম্নাংশ তৈরি হল, আর ব্রহ্মা তাঁর অমিতশক্তি দিয়ে নির্মাণ করলেন দেবী দুর্গার শ্রীচরণদ্বয়।

দশভুজার দশবাহুতে—শূলপাণি মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, সর্বব্যাপী বিষ্ণু দিলেন চক্র, জলাধিপতি বরুণ দিলেন শঙ্খ, সর্বশক্তিধর হুতাশন দিলেন শক্তি, সদাগতি পবনদেব দিলেন ধনুর্বাণ, দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন বজ্র ও ঐরাবত ঘণ্টা, প্রেতাধিপতি যমরাজ দিলেন কালদণ্ড, প্রজাপতি দিলেন অক্ষমালা, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডুলু, বিশ্বকর্মা দিলেন কুঠার, নগাধিরাজ হিমালয় দিলেন সিংহ, নাগরাজ বাসুকি দিলেন নাগহার। এইভাবে দেবাংশসম্ভূতা দশভুজা হয়ে উঠলেন দশপ্রহরণধারিণী।

জগত্তারিণী দেবী দুর্গার বাম দিকে থাকেন মা সরস্বতী। মা সরস্বতী হলেন জ্ঞানশক্তি বা ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রতীক। দেবী সরস্বতীর বাম পাশে থাকেন কার্তিক। ধনুর্ধারী দেব-সেনাপতি কার্তিক হলেন ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। দেবী দুর্গার ডান দিকে থাকেন দেবী লক্ষ্মী। দেবী লক্ষ্মী হলেন ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তির প্রতীক। এরপর থাকেন গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ হচ্ছেন গণশক্তি বা জনশক্তি বা শূদ্রশক্তির প্রতীক। গণেশের ডানদিকে থাকেন কলাবউ। লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিতা ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় বিরাজ করেন কলাবউ বা নবপত্রিকা। নবপত্রিকা মূলত দেবী দুর্গারই রূপ। দুর্গার নয় রূপ এই নবপত্রিকায় বিরাজ করেন। নয়টি গাছের ভেষজগুণ এবং দেবী শক্তি নিয়ে তৈরি হয় নবপত্রিকা। কদলী, কোষ্ঠ সাফ করে এবং এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী, যিনি ব্রহ্মশক্তির প্রতীক। ধান্য, শ্বেতসার যুক্ত বলবর্ধক শস্যদানা খাদ্য, যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা লক্ষ্মী। হরিদ্রা, রোগ-জীবাণু দূর করে, এর অধিষ্ঠাত্রীদেবী মা দুর্গা। কচু, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা। মানকচু, বাতের ব্যথা উপশম করে এবং রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত বৃদ্ধি করে, এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা চামুণ্ডা। জয়ন্তী, রোগ-জীবাণু দূর করে, এর অধিষ্ঠাত্রীদেবী কার্তিকী। অশোক, মহৌষধ হিসাবে মধুমেয় রোগ দূর করে, এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দাড়িম্ব, এই গাছের পাতা, ছাল এবং ফল আমাশয় ঘটিত রোগের উপশম ঘটায়, এর অধিষ্ঠাত্রীদেবী শিবা। এই নয়টি পত্রিকা যুক্ত গাছ শ্বেত অপরাজিতা ফুলগাছের লতা এবং হলুদ রঙের সুতা অথবা পাটদিয়ে বন্ধন যুক্ত করা হয়। বৃহন্নান্দিকেশ্বর পুরাণে নবপত্রিকা প্রসঙ্গে নব-দুর্গা হিসাবে— কুমারিকা, ত্রিমূর্তি, কল্যাণী, রোহিণী, কালী, চণ্ডিকা, শান্তরী, দুর্গা এবং ভদ্রা এই নবনামিকা কন্যার কথা বলা হয়েছে। মানুষ এবং মানুষের সমাজকে সুস্থ, সবল ও সজীব রাখার এক মাতৃপ্রতীকরূপ হলো এই নবপত্রিকা। শস্যলক্ষ্মীরূপে মা দুর্গার প্রতিনিধি এই নবপত্রিকা। নবপত্রিকার মাধ্যমে প্রণাম জানাই মা দুর্গা-লক্ষ্মীকে। ওঁ হ্রীং নবপত্রিকা বাসিন্যৈদুর্গায়ৈনমঃ।

দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন অনেক বিশেষ স্থানে কুমারী পূজা হয়। এই পূজা দেখার জন্য পূজাস্থানে মানুষের ভিড় উপ্‌চে পড়ে। কুমারী, হলো দেবী দুর্গার প্রতীক। কুমারী পূজার ক্ষেত্রে বয়স অনুসারে ভিন্ন নামে কন্যাকে অভিহিতা করা হয়। এক বছরের কন্যাকে 'সন্ধ্যা' নামে অভিহিতা করা হয়। দুই বছরের কন্যাকে 'সরস্বতী', তিন বছরের কন্যা—'ত্রিধামূর্তি', চার বছরের কন্যা—'কালিকা', পাঁচবছরের কন্যা 'সুভগা', ছয় বছরের কন্যা—'উমা', সাতবছরের কন্যার নাম হয়—'মালিনী' এবং আট বছরের কন্যাকে—'কুব্জিকা' নামে অভিহিতা করা হয়। এইভাবে ষোলোবছর বয়স পর্যন্ত কুমারী মেয়েকে পূজা করা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চার থেকে আট বছরের মধ্যে কুমারী মেয়েদের পূজা করা হয়।

তান্ত্রিক পূজা মতে বলিদান পূজার অন্যতম একটি প্রধান অঙ্গ। বল্ ধাতুর অর্থ বলন বা প্রাণন, সংবরণ বা আচ্ছাদন। যে ক্রিয়ার মাধ্যমে বলের সঞ্চার হয়, জীবনী শক্তিকে সংবৃত করে, আচ্ছাদিত করে, ক্ষয় থেকে রক্ষা করে তাই হলো বলি। কালিকা-পুরাণের একাত্তরতম অধ্যায়ে বলিদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিধান আছে। বিভিন্ন শাস্ত্র মতে যে কোনো প্রাণীকে বলিদান দেওয়া যায় না। বলিদানের যোগ্য প্রাণীদের তালিকায় আছে—বেড়াল, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গন্ডার, কুমির ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাকাল সংহিতা'-য় অনুকল্প বলির বিধানও আছে। বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচারী, দয়ালু গৃহস্থ, সঙ্গতিহীন ব্যক্তি, বানপ্রস্থাশ্রমী প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি পশুর অনুকল্পে আখ, কুমড়ো, লাউ, বেগুন, পিটুলি ও ক্ষীরের পিণ্ড দিয়ে বানানো পশুর পুতুলকে বলি দিতে পারেন। কোথাও কামকে ছাগ এবং ক্রোধকে মহিষ জ্ঞানে বলি দেওয়ার বিধান আছে। পশু হলো প্রবৃত্তিরূপ এবং খড়্গ হলো ছেদকরূপ—এমন মননে সাধক নিজের দুর্ধর্ষ কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বলি ক্রিয়ার মাধ্যমে ছেদন করেন।

সৃষ্টি রক্ষার্থে—ব্রহ্মা রজোগুণময়, তিনি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু সত্ত্বগুণময়, তিনি সৃষ্টি পালন করেন। শিব তমোগুণময়, তিনি রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। মা দুর্গা চেতনস্বরূপ ও জড়স্বরূপ-এর অভিন্ন সত্তায় প্রকাশিত হয়ে বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে বিরাজমানা। তিনি নিত্যা হয়েও মূর্তিমতী স্বয়ং এই বিশ্বের প্রকাশ স্বরূপা। উপাস্যা মা দুর্গার সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশ তথা পৃথিবীর সমস্ত উপাসকের (উপাসক মানুষের) মিলন মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের স্তরকে উন্নীত করে থাকে। মাতৃসাধনার ধারায় অন্যতম প্রধান হলো শারদীয়া দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা পৃথিবীর অন্যান্য আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্লভ। তাই মানবলোকে দুর্গাপূজা চিরন্তন এক মহাপূজা যা আমাদের সকলের শরীরের শিবসত্তায় একীভূত হয়ে যায়।

# বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালী মাতার পুজো



**সপ্তর্ষি ঘোষ**

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে বি কে পাল পার্কে সার্বজনীন নৃত্যকালী মাতার পুজো আজও সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় মহালয়ার এক মাস আগে ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়। এই পুজো শুরুর নেপথ্যে এক জনশ্রুতির কথা জানা যায়। দ্বিশতাধিক বছর আগে শোভাবাজার অঞ্চলে গঙ্গা তীরবর্তী বেনিয়াটোলা স্নানের ঘাটে 'মোহনটুনি' নামে একজন শক্তি সাধিকার আবির্ভাব ঘটে। ধ্যানে এই সাধিকার মনে যে মূর্তির উদয় হয়, সেই মূর্তিই 'নৃত্যকালী' মাতা রূপে দুশো পঞ্চাশ বছর ধরে পূজিতা হচ্ছেন। সাধিকা 'মোহনটুনি'কে নৃত্যকালী পুজোর প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে গণ্য করা হয়। শোভাবাজার আহিরিটোলা এলাকায় 'মোহনটুনির ঘাট' নামটিও সেই সন্ন্যাসিনীর স্মৃতি বহন করছে। ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) নৃত্যকালী মাতার পুজোর সূচনা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

নৃত্যকালী মাতার সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীও আসীন। মধ্যস্থলে শায়িত মহাদেবের বক্ষে নৃত্যরতা মাতৃমূর্তি। দুই পাশে সহচারীদ্বয়— জয়া ও বিজয়া। সম্মুখে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের প্রতীক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ। নৃত্যকালী মাতার সঙ্গে সকলেই পূজিত হন। এছাড়া শৌর্য বীর্যের প্রতীক হিসাবে দুই পাশে দুই ঘোড় সওয়ার, নৃত্যগীতের প্রতীক বেশ কয়েকটি পরী এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সময়ানুবর্তিতার প্রতীক এক সুদৃশ্য চিল ঘড়ি দেবীর চালচিত্রের শোভাবর্ধন করছে। এরকম অভিনব মূর্তি বিরল দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরী পুজোর দিন কাঠামো পুজো হয় এবং রথযাত্রায় প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। বর্তমান কাঠামোটি শতাধিক বছরের প্রাচীন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। একই পরিবারের মৃৎশিল্পীরা বংশ পরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতিমার সাজসজ্জাও মালাকারগণ পুরুষানুক্রমে করছেন। সুষ্ঠুভাবে নৃত্যকালীমাতার পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার গঠন করা হয়েছে। অতীতে পুজোয় ছাগ, মেঘ ও মহিষ বলিদানের প্রথা ছিল। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ বলিদানের অবসান হয়েছে।

শোভাবাজার অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পুজো অনুষ্ঠিত হবার পরে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালী মাতার পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২৯ আগস্ট থেকে তিনদিন ব্যাপী পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পূজাপ্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসবে। এবছর পুজো ২৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করলো।

১ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মাতৃপ্রতিমা এলাকা পরিক্রমা করে আহিরিটোলা ঘাটে নিরঞ্জন হবে। পরম্পরা বজায় রেখে তরুণ কর্মীরা উৎসাহ সহকারে প্রতিমা কাঁধে করে গঙ্গাবক্ষে নিয়ে যায়। একই কাঠামোয় আড়াইশো বছর ধরে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেজন্য কাঠামো বিসর্জিত হয় না।

নিরঞ্জনের পূর্বে প্রতিমা বরণ সিঁদুর খেলায় পল্লীর মহিলাদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ নৃত্যকালী মাতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। ▮

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩


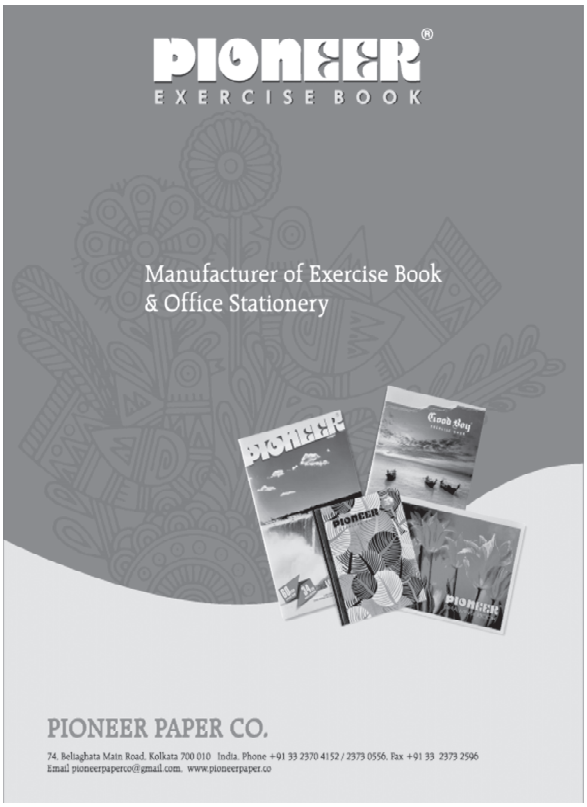



# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**


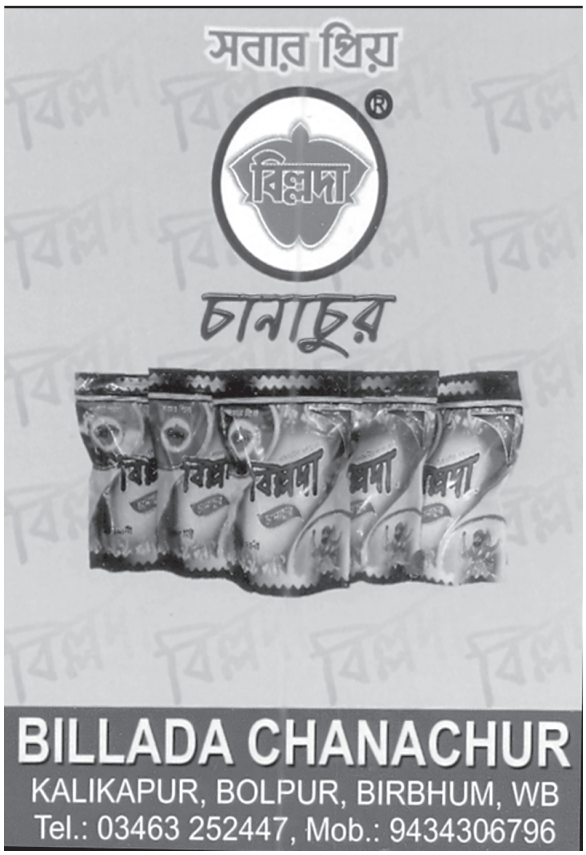



# দ্বিশতবর্ষের আলোকে দয়ারসাগর

**ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী**

বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত জড়বাদী বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের পরিচিতি ছিল একটি দরিদ্র দেশ রূপে। এহেন একটি সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো একজন সুউচ্চ ব্যক্তিত্ববান ও দয়ালু প্রাণের উপস্থিতিতে— এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বর প্রদত্ত এহেন এক অবিসংবাদী মরমি ব্যক্তি যাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সারল্য, গগণচুম্বী মহত্ত্ব, সমাজের প্রতি হিমালয় তুল্য সুউচ্চ ন্যায়পরায়ণতা, রত্নের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য, নদীর ন্যায় প্রবহমান, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সমুদ্রের ন্যায় দয়া— এইসব কিছুর এক দুর্লভ সমাহারে বিদ্যাসাগর এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে একজন সংসারী ব্যক্তিত্ব হয়েও কেবলমাত্র বাহ্য বিলাসিতার জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রেখে দেশের স্বার্থে, মানবজাতির জাগৃতির লক্ষ্যে পরোপকারী এই মহান সমাজ সংস্কারক, রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বিশেষত বঙ্গের সামাজিক জীবনে যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তা প্রতিটি ব্যক্তির মননে উষ্ণ স্পর্শের অনুভূতি রেখে যাবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। তাঁর জীবনধারা, আশীর্বাদ স্বরূপ ভালোবাসার ফল্গুধারা সমগ্র বাঙ্গালির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে চিরকাল।

১২ আশ্বিন ১২২৭ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০) সোমবার হুগলীর বীরসিংহ গ্রামে (অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত) ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহিয়সী ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি, অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁর অবিচল লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য (পিতামহের মৃত্যুর পর) পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক পণ্ডিত কালিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ, নম্র, ভদ্র, নিরহংকারী, নিরভিমানী, আচরণ, অপরিসীম সততা এবং অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সেই সময় তাঁর পিতা বড়বাজারের একটি দোকানে সামান্য কেরানির কাজ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র জোড়াসাঁকো সংলগ্ন একটি পাঠশালায় ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন, তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করে গ্রামে ফিরে গিয়ে পারিবারিক প্রথামতো চতুষ্পাঠীর শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু পরিবারের এক সদস্য মধুসূদন বাচস্পতির (যিনি সেই সময় সংস্কৃত কলেজে পড়তেন) উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় বিষয়ের পাঠ নেবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে। এই সিদ্ধান্তই বাঙ্গলার পরবর্তী ইতিহাসের কালজয়ী ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করল। এর পরবর্তী সময়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলিতে চোখ ধাঁধানো সাফল্য তাঁর ঝুলিতে এনে দিল একাধিক পুরস্কার ও স্কলারশিপ, যা তাঁর দারিদ্র্য প্রশমনে সহায়ক হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় প্রায় হাফ ডজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য কিশোর ঈশ্বরের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৮৩৯ সালে হিন্দু ল' কমিটি পরিচালিত আইন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তাঁকে কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ও বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বে পরিণত করে তোলে। পুরস্কার স্বরূপ তরুণ বয়সেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে 'পণ্ডিত' রূপে যোগদান করেন। কলেজের সেক্রেটারি জি.টি. মার্শাল মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর এই সাম্মানিক পদ গ্রহণে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। মার্শালসাহেব বিদ্যাসাগরের স্কুল জীবনের অসামান্য সাফল্যে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। পাঁচবছর এই কলেজে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। চাকরির প্রথম বর্ষেই তিনি শিক্ষা কারিকুলামের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিস্তারিত ভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে লেখা এই খসড়া যদিও তৎকালীন কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত (যিনি তাঁর প্রতি খানিকটা বিরাগভাজন ছিলেন) দ্বারা সমালোচিত হলেও উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিশেষত মার্শাল সাহেব তাঁর প্রতি আরও অনুরক্ত হয়ে পড়েন। রসময় দত্তের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন, এবং মার্শালের হস্তক্ষেপে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরে যান।

ঈশ্বরচন্দ্রের নীতিবোধ ও সাহস ছিল অতুলনীয়। নিজের লক্ষ্য থেকে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতেই বিরত হতেন না। ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে আপোশ করা কাকে বলে তা তিনি কখনই জানতেন না। তাঁর অভিধানে 'ভয়' শব্দটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মতবিরোধের কারণে সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের সময় শ্রী দত্ত যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি এর পর কী করবে? কী ভাবে বাঁচবে?' তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন 'প্রয়োজনে আমি সবজি বিক্রি করব, কোনো একটি উপায় ঠিক বের করব বেঁচে থাকার জন্য।'

অপর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনা থেকে। বিদ্যাসাগর একবার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মি. কেরির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বুটপরিহিত কেরিসাহেব পা দুটি টেবিলের উপর রেখে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত্যন্ত অভব্য ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে কেরি যখন সংস্কৃত কলেজে বিশেষ পরিদর্শনে যান, সমুচিত ভাবে বিদ্যাসাগরমশাই তাঁকে তাঁর ব্যবহারটি ফিরিয়ে দেন, যাকে কথ্য ভাষায় বলে 'মুখের উপর সমুচিত জবাব।' ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের লেকচারার পদে পুনর্বহাল হন। শিক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদান ও কর্তব্য নিষ্ঠাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর সাম্মানিক দ্বিগুণ করা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রচিত হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে নবদিগন্তের।

প্রথাগত প্রাচ্য শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী, উন্মুক্ত মননের পূর্ণবিকাশ সাধনের মাধ্যমে তরুণ-যুব সমাজের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে শিক্ষা-জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরণকে সুনিশ্চিত করতে। তাঁর মুক্ত মননটি ছিল সত্য ও বাস্তবিকতার প্রকৃত উন্মেষ ঘটাতে সদা সচেষ্ট।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ হওয়ার সুবাদে তিনি সারা বঙ্গপ্রদেশে চষে বেড়ান। এই পদাধিকার বলেই সমগ্র বঙ্গের শিক্ষা পরিস্থিতিকে সরজমিনে ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র বঙ্গ জুড়ে শিক্ষার বেহাল দশা তাঁকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল। মরমি বিদ্যাসাগর (মাত্র ২ মাসের মধ্যে) দ্রুত ২০টি মডেল স্কুল গঠন করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তার ছাড়া সামাজিক বৈষম্য ও নারীদের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সুরাহা করা সম্ভব নয়। দিবারাত্র কাজ করে তিনি ৩০টি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ করে 'বোর্ড অব এগজামিনারস্' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগর এই বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শিক্ষাদপ্তরের নবনিযুক্ত যুবা প্রধানের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে ১৮৫৮ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগ করেন। সম্ভবত এই বিশ্বে এমন কোনো বাঙ্গালি নেই যে তাঁর অমর কীর্তি 'বর্ণপরিচয়' (যা ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়) সম্পর্কে জানে না। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধনে তাঁর অমূল্য অবদান বাঙ্গালি চিরকাল অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে।

আপতরূঢ় বিদ্যাসাগরের হৃদয়টি ছিল খাঁটি সোনা— দয়ায় পরিপূর্ণ। এই হৃদয় সব সময় ব্যাকুল থাকত দরিদ্র, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষদের জন্য। এমনকী যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, স্কলারশিপের একটি অংশ ব্যয় করতেন গরিবদের জন্য খাবার ও ওষুধ কেনার জন্য। পরবর্তী সময়ে তাঁর একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা, পরিবারের ভৃত্য এমনকী পাড়া পড়শী, গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলি এবং গ্রামের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য তিনি নির্দিষ্ট মাসোহারা বরাদ্দ করেছিলেন। এমনকী কর্মহীন হয়ে পড়ার পরও তিনি এই মাসোহারা কখনও বন্ধ করেননি। এই জন্য প্রয়োজনে বহুবার তাঁকে ধারও করতে হয়েছে। একবার মহারানি স্বর্ণময়ীদেবীর কাছ থেকে তিনি এই বাবদ ৭,৫০০ টাকা ধার করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে সংস্কৃত কলেজের দরজা উন্মুক্ত হয়েছিল। কলেরায় আক্রান্ত রুগিদের নিজে হাতে সেবাদান, অশনাক্ত মৃতদেহের সৎকার— এহেন সামাজিক অবদানের তালিকা সমাপ্ত হবে না। হাজারো নোবেল পুরস্কারও তাঁর সমুদ্রের ন্যায় পরিব্যপ্ত মানবদরদি অবদানের ধারেপাশেও ঘেষতে পারবে না— এহেন এক স্বর্ণময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিধবাদের পুনর্বিবাহ, শিশু বিবাহ রোধ, নারীশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এই সকল বিষয়ে তাঁর অবদান ছিল অবিসংবাদী।

হিন্দু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে মহিলাদের পর্দানশীন করে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর সমাজ সংস্কারে হিন্দু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে যতবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, বলিষ্ঠ বিদ্যাসাগরের শাণিত যুক্তির কাছে ততবার মাথা নত করতে হয়েছে সমাজের মাতব্বরদের। হিন্দুশাস্ত্রের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলস্বরূপ বিদ্যাসাগর প্রমাণ করতে সক্ষম হন কোনোভাবেই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বা পাপ নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত চারটি খণ্ডে পুস্তক প্রকাশ করেন। এমনকী তিনি নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে এক বাল্যবিধবার বিবাহ দিতে পিছপা হননি। প্রত্যাশিত ভাবেই এই সংস্কারে তিনি তথাকথিত শাস্ত্রকারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন বহুবার, কিন্তু তাঁর বজ্রকঠিন দৃঢ়তায় বারংবার তা প্রতিহত হয়। অবশেষে সরকারি ভাবে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন স্বীকৃতি পায়। সারা জীবনের তাঁর বেশিরভাগ রচনাই সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে। তাঁর নববঙ্গীয় রচনার পথ ধরে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে উন্নততর ও স্বর্ণখচিত সাকার রূপদান করেছেন বহু সাহিত্যিক টেক্‌চাঁদ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'আধুনিক বাংলা রচনার পিতৃদেব' রূপে। বিদ্যাসাগরের এই ক্ষেত্রে অপর একটি অনন্য অবদান হলো বহু সংখ্যক সংস্কৃত প্রবন্ধকে বাংলায় অনুবাদ করা। ফলস্বরূপ সাধারণ বাঙ্গালি সমাজ বিশেষত সংস্কৃতে যারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ নন, তাদের কাছে কথ্য ও সাবলীল মাতৃভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য-অনবদ্য কীর্তিগুলি উপস্থাপিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে বিখ্যাত বহু ব্যক্তিত্বের জীবনী বাংলাভাষায় রচনা করে বিশেষত যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সকল মহৎ ব্যক্তিত্বের কঠোর পরিশ্রম, সততা, ধৈর্য, সাহস, লক্ষ্যে অবিচল থাকার মানসিকতা, জীবনদর্শন ইত্যাদি দিকগুলির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে এক সৎচরিত্র যুবসমাজ গঠনে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক বেতাল পঞ্চবিংশতি (যা সংস্কৃতের কথাসরিৎসাগরের বঙ্গানুবাদ)। তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শকুন্তলা (১৮৫৪), মহাভারত (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০) ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪) ও রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)। সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম বিধবাবিবাহ (১৮৫৫), বহুবিবাহ (১৮৭১ ও ১৮৭৩), বাল্যবিবাহ (প্রকাশের তারিখ অজ্ঞাত) প্রভৃতি। এই রচনা সমূহ তাঁকে অমর করেছে। পোশাক পরিচ্ছদেও আপাদমস্তক সরল, সাধারণ বাঙ্গালিপনায় ন্যাস্ত এক মহৎ প্রাণ, এমনকী বাড়িতে প্রস্তুত সুতির পোশাকই ছিল তাঁর সারাজীবনের পরিধেয় (যা তাঁর মাতৃদেবী স্বহস্তে তৈরি করতেন)। ব্যক্তিগত জীবনে একাকিত্বে ভরা এক বৃহৎ মহীরুহ যার জীবদ্দশাতে প্রকৃত কোনো মূল্যায়নই হয়নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে মাতৃদেবী ভগবতীদেবীর প্রভাব ছিল সীমাহীন, যিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে জীবনের শিক্ষাকে কখনই জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নেই। মাতৃভক্তির নজিরবিহীন নমুনা স্বরূপ কথিত আছে মাতৃআজ্ঞা পালনে প্রবল বর্ষণের রাতে তিনি সাঁতরে দামোদর নদ পার হয়েছিলেন!

লোকশিক্ষক হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক সময় বিদ্যাসাগর মশাই কোনো একটি গ্রামে বক্তৃতা দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। একজন তরুণ অফিসারও বিদ্যাসাগরের বক্তব্য শোনার জন্য সেই ট্রেনে যাচ্ছলেন, স্টেশনে নেমে সেই অফিসার তার সুটকেশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুলির খোঁজ করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরমশাই স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে তার সুটকেশটি নিজেই বহন করে নিয়ে যান। পরে সভাকক্ষে যখন বিদ্যাসাগরকে তিনি দেখেন, অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁর বোধোদয় হয়। বিদ্যাসাগর তখন সেই যুবক অফিসারকে বলেন যে, নিজের কাজ নিজে করা অত্যন্ত গৌরবের। এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এহেন ঘটনাবহুল জীবন নিয়ে এই মহান সমাজব্রতী বাঙ্গালি জীবনে এক স্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছেন। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে। কিন্তু আপোশহীন এই পুরুষসিংহ প্রাণ মাথা উঁচু করে বেঁচে থেকে ৭১ বছর বয়সে কলকাতার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৯ জুলাই ১৮৯১। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষের প্রাক্কালে কলকাতার অন্যতম উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিদ্যাসাগর কলেজের (পূর্বে মেট্রোপলিটন কলেজ নামে খ্যাত) একজন সহকারী অধ্যাপক রূপে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে জীবন ধন্য মনে হয়। তাঁর অমর অক্ষয় কীর্তিগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এই জ্ঞান তাপসের চরণে প্রণাম নিবেদন করি।

*(লেখক বিদ্যাসাগর কলেজের সহকারী অধ্যাপক)*

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর আগে শেষ হচ্ছে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরবর্তী নবীকরণের টাকা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে জমা করুন। যাতে আপনার পূজা সংখ্যাটি পাঠানো সম্ভব হয়।
- স্বস্তিকার এজেন্টদের বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আগষ্ট '১৯ মাসের বিল সমেত সমস্ত বকেয়া টাকা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পাঠান, যাতে আপনার প্রয়োজনীয় পূজা সংখ্যা সময়মতো পাঠানো যায়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# সর্বোত্তম জয়

এক গ্রামে প্রতাপ সিংহ নামে একজন কৃষক বাস করত। প্রতাপ সিংহ সিংহের মতোই ক্রূর আর দাম্ভিক ছিল। সে সামান্য কথায় রেগে গিয়ে মারামারি লাগিয়ে দিত। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কোনোদিন সোজাভাবে কথা বলত না। সে কারো সুখ-দুঃখের কোনো ধার ধারত না। কারো সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে তাচ্ছিল্যভরে মুখ ঘুরিয়ে নিত। গ্রামে অন্য চাষিরাও তাকে অহংকারী জেনে তার সঙ্গে কথা বলতো না।

ওই গ্রামে দয়ারাম নামে এক কৃষক অন্য গ্রাম থেকে এসে বসবাস করছিল। সে ছিল খুবই সরল আর সৎ। সবার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতো। সবাইকে কোনো না ভাবে সাহায্য করত। গ্রামের সব চাষিই তাকে খুব ভালোবাসতো আর কাজেকর্মে তার পরামর্শ নিত।

গ্রামের কৃষকরা দয়ারামকে বলল– 'ভাই দয়ারাম, তুমি প্রতাপ সিংহের বাড়ি কোনোদিন যেও না। ওর থেকে দূরে থাকবে। ও ভীষণ ঝগড়াটে।'

দয়ারাম হেসে বলল– 'প্রতাপ সিংহ আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে কেন? তাছাড়া ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে আমি ওকে মেরে ফেলব।' এসব শুনে গ্রামের কৃষকরা হাসতে লাগলো। কারণ ওরা জানতো যে দয়ারাম খুব দয়ালু। ও কাউকে মারা তো দূরের কথা, কাউকে গালাগালি পর্যন্ত করতে পারে না। কিন্তু কথাটা একদিন কেউ না কেউ প্রতাপ সিংহের কানে তুলে দিয়েছিল। শুনে প্রতাপ সিংহ তো রেগে আগুন। সে সেইদিন থেকে দয়ারামের সঙ্গে ঝগড়া করার ছুতো খুঁজতে লাগলো। সে একদিন দয়ারামের খেতে তার গোরু-বাছুর সব ছেড়ে দিল। গোরুগুলো খেতের সব ফসল খেয়ে ফেলল। কিন্তু দয়ারাম চুপচাপ তার খেত থেকে গোরুগুলো তাড়িয়ে দিল।

প্রতাপ সিংহ একদিন দয়ারামের খেতে জল যাবার নালা কেটে দিল। ফলে সব জল জমির বাইরে যেতে লাগল। দয়ারাম এসে চুপচাপ নালাটা আবার ঠিক করে বেঁধে দিল। এভাবে প্রতাপ সিংহ সবসময় দয়ারামের



ক্ষতি করতে থাকে। কিন্তু দয়ারাম একবারও তাকে ঝগড়া করার সুযোগ দিল না।

একদিন দয়ারামের এক আত্মীয় তার বাড়ি থেকে অনেকগুলি তরমুজ পাঠিয়েছে। দয়ারাম গ্রামের সবার ঘরে একটা করে তরমুজ পাঠিয়ে দিল। কিন্তু প্রতাপ সিংহ তরমুজ ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠায়–' আমি এত ভিখিরি নই। অপরের দান আমি গ্রহণ করি না।' এতেও দয়ারামের মনে কোনো খেদ নেই। এরপর এল বর্ষাকাল। প্রতাপ সিংহ একদিন তার গোরুর গাড়িতে করে পাশের গ্রাম থেকে তরিতরকারি নিয়ে আসছিল। রাস্তার নালায় তার গাড়িটা আটকে গেল। প্রতাপ সিংহের বলদ দুটো ছিল খুব দুর্বল। অনেক চেষ্টা করেও নালা থেকে গাড়িটা টেনে তুলতে পারল না। গ্রামে যখন এই খবর পৌঁছল তখন সবাই বলল ঠিক হয়েছে। ও খুব বজ্জাত। ওকে ওখানেই পড়ে থাকতে দাও।

কিন্তু দয়ারাম কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের শক্ত-সবল বলদ দুটো নিয়ে নালাটার দিকে চলল। গ্রামের লোকেরা তাকে বলল-- দয়ারাম, প্রাতাপ সিংহ তোমার অনেক ক্ষতি করেছে। তুমি তো বলেছিলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে তুমি ওকে মেরে ফেলবে। আর আজ তুমি ওকে সাহায্য করতে চললে?

দয়ারাম বলল--' আজ আমি সত্যি সত্যি ওকে মেরে ফেলব। তোমরা সব দেখে যাও।

যখন প্রতাপ সিংহ দয়ারামকে তার বলদ দুটো নিয়ে আসতে দেখল তখন চিৎকার করে বলে উঠল-- 'তোমার বলদ নিয়ে ফিরে যাও। আমি কারও সাহায্য চাই না।' দয়ারাম বলল-'তোমার মন চায় তো গালাগলি করো, আমাকে মারো। কিন্তু এসময় তুমি বিপদে পড়েছ, তোমার গাড়ি কাদায় আটকে গেছে, আর রাত হয়ে আসছে। এসময় তোমার কোনো কথাই শুনব না।'

দয়ারাম প্রতাপ সিংহের বলদ দুটো খুলে নিজের বলদ দুটো গাড়িতে জুড়ে দিল। দয়ারামের শক্ত-সবল বলদ দুটো গাড়িটাকে নালা থেকে টেনে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। প্রতাপ সিংহ গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার দুষ্ট স্বভাব সেদিন থেকে একেবারে বদলে গেল। ও বলে বেড়াতে লাগলো--'দয়ারাম আমার উপকার করে আমাকে মেরেই ফেলেছে। আমি সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এখন মনস্তাপে ভুগছি।

এরপর প্রতাপ সিংহের ব্যবহার আমূল বদলে গেল। মিষ্টি মুখে ভালোভাবে সবার কথা বলে। আসল কথা হলো, সৎ ব্যবহারের দ্বারা মানুয়ের মন জয় করাই প্রকৃত জয়। বাস্তবে দয়ারামই প্রকৃত শক্তিমান পুরুষ ছিলেন।

**শম্ভুনাথ পাঠক**

## ভারতের পথে পথে

# অযোধ্যা



শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যা। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ সূর্যবংশীয় রাজারা মনুর সৃষ্ট অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রামচন্দ্র আবির্ভূত হন অযোধ্যায়। সরযূ নদীর দক্ষিণতীরে সপ্ততীর্থের অন্যতম পবিত্র হিন্দু তীর্থ তথা মোক্ষপুরী এই অযোধ্যা। ৪৮ x ৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত অযোধ্যা নগরীর অতীত গরিমা এখন লোপ পেয়েছে। গুপ্তযুগে রাজা বিক্রমাদিত্য রামলালা মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। সরযূ নদীর ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যে ৭ হাজার মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে হনুমানগড়ি, রামকচহরী, ভরত মিলাপ, কনক ভবন, জন্মভূমি মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতীতের মূল মন্দির বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হলেও কিংবদন্তীতে ঘেরা রামজন্মস্থানের আকর্ষণ আজও অদ্বিতীয়। পুলিশ প্রহরায় প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত রামজন্মস্থানে রামলালাকে দর্শন করেন।

## জানো কি?

**ভারতের মোক্ষদায়িনী সপ্তপুরীর অবস্থান**

- অযোধ্যা—সরযূতীরে, উত্তরপ্রদেশ।
- মথুরা—যমুনাতীরে, উত্তরপ্রদেশ।
- মায়া(হরিদ্বার)---গঙ্গাতীরে, উত্তরাখণ্ড।
- কাশী—গঙ্গাতীরে, উত্তরপ্রদেশ।
- কাঞ্চীপুরম্---চেন্নইয়ের কাছে, তামিলনাড়ু।
- অবন্তিকা(উজ্জয়িনী)—শিপ্রাতীরে, মধ্যপ্রদেশ।
- দ্বারকা—সিন্ধুসাগর তীরে, গুজরাট।

## ভালো কথা

# নবাঙ্কুরের বন্ধুদের প্রতি আবেদন

আমি বহুদিন থেকেই প্লাস্টিকের বিরোধী। বিশেষ করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, প্লাস্টিকের গেলাস, থার্মোকলের থালা ব্যবহারে। আমি যখন অঙ্কুরে পড়ি তখন প্রথম আমাদের বড় দাদাভাই আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করেন। আমাদের বাড়িতেও এসব ব্যবহার হয় না। আমি সবাইকে এসব ব্যবহার না করার জন্য বলতাম। কেউ শুনতো আবার কেউ শুনতো না। তবু আমি হাল ছাড়িনি। এখন আমার খুব ভালো লাগছে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্লাস্টিক ব্যবহার না করতে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বলিউড তারকা আমির খান এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। স্বস্তিকার নবাঙ্কুরের বন্ধুদের কাছে আমার আবেদন, প্লাস্টিক মুক্ত ভারতের জন্য সবাই সচেতন হই। আর আমরা নিজের থেকেই তা শুরু করি।

**শ্রেয়সী চৌধুরী,** অষ্টম শ্রেণী, ধূপগুড়ি মিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

***তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।***

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| ১) তু রা সে | ১) টি টা পা পা ল ল |
| ২) ল মা য় | ২) ফু ফু সু সু র র |

**১৯ আগস্ট সংখ্যার উত্তর**

১) হৃদয়গ্রাহী ২) খাতাপত্তর

**১৯ আগস্ট সংখ্যার উত্তর**

১) চিকিৎসাবিভ্রাট ২) ভিন্নমতাবলম্বী

**উত্তরদাতার নাম**

১) আদৃতা দলই, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূঃ মেদিনীপুর। ২) সায়নী দে, পলাশী, নদীয়া। ৩) সুমিতা মণ্ডল, মল্লারপুর, বীরভূম। ৪) সৌমী হালদার, ১৮ মাইল, মালদা।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৬।।

কেশব রামপায়লী পৌঁছল। সেখানে শুরু করল বিপ্লবী তৎপরতা। এক রাত্রে বোমা ছুঁড়ল থানায়।



তারপর সকলের চোখে দুলো দিয়ে রামপায়লী থেকে চলে গেল। পুলিশ অনেক দৌড়ঝাঁপ করেও সফল হতে পরল না।




পৌঁছল নাগপুর। পরামর্শ করলো বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের সঙ্গে।




ওই বিদ্যালয়টিও তখন ইংরাজদের কোপে পড়েছে।



শেষে বিদ্যাগৃহের উপরও পড়ল সরকারি বাঁধন।

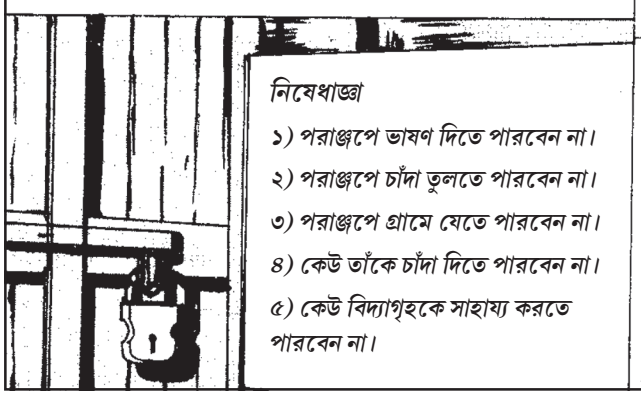

নিষেধাজ্ঞা

১) পরাঞ্জপে ভাষণ দিতে পারবেন না।

২) পরাঞ্জপে চাঁদা তুলতে পারবেন না।

৩) পরাঞ্জপে গ্রামে যেতে পারবেন না।

৪) কেউ তাঁকে চাঁদা দিতে পারবেন না।

৫) কেউ বিদ্যাগৃহকে সাহায্য করতে পারবেন না।

বন্ধ হলো বিদ্যাগৃহ। পুণা ও অমরাবতীতে গিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কেশব। তারপর এলো নাগপুরে। পুলিশের লোক সবসময় তখন তার পিছনে।



ক্রমশ

# অবশেষে সিন্ধু সভ্যতার পত্তন হলো : দীপু ঘোষ

*দীপু ঘোষ, নামটি এখনো আপামর বাঙ্গালির মননে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আপাদমস্তক সুভদ্র এই প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা বেশ কয়েকবছর যাবৎ উত্তর মেরু সন্নিহিত আইসল্যান্ডের বাসিন্দা। বহু বছর সে দেশের জাতীয় কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। পিভি সিন্ধু বিশ্ববিজেতা হওয়ার পরদিন একটি জাতীয় সংবাদপত্রে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া হলো।*

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**□ কী মনে হচ্ছে? সিন্ধু কতদূর যেতে পারবে?**

**দীপু ঘোষ :** সিন্ধু লম্বা রেসের ঘোড়া। অন্য ধাতুতে গড়া। ভারত তো বটেই, বিশ্বের সর্বকালের সেরাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। যেভাবে প্রতি বছর ধাপে ধাপে উন্নতি করে চলেছে, তাতে বলা চলে দুনিয়াদারি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় সামগ্রিক খেলার সংস্কৃতিটাই বদলে যাবে এহেন সাফল্যের পর। ফুটবল, ক্রিকেট বাদে অন্য সব খেলা এবার আমজনতা ও মিডিয়ার কাছে বাড়তি গুরুত্ব পাবে। যুব সম্প্রদায় বলিউডের তারকা ছেড়ে সিন্ধুকে 'আইকনিক আইডল' বেছে নেবে। এই দৃষ্টিকোণে সিন্ধুর এই অসাধারণ কীর্তিকে পুনর্মূল্যায়ন করব আমি। এটাই প্রকৃত সিন্ধু সভ্যতার জয়গান রচিত হলো।

**□ প্রকাশ পাড়ুকোনের সাপেক্ষে কোথায় রাখবেন সিন্ধু কে?**

**দীপু ঘোষ :** প্রকাশ পাড়ুকোন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে নাবালক থেকে সাবালকত্বে উন্নীত করেছিলেন। আমার সময়ে দীনেশ খান্না এশিয়ান চাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেভাবে দেশে আড়োলন ফেলতে পারেননি। কারণ তখন দেশে ক্রীড়াসংস্কৃতির সচেতনতা তৈরি হয়নি। তারও আগে জর্জট মাস দেশ স্বাধীন হবার পরপরই অল ইংল্যান্ডে রানার্স হয়েছিলেন। কিন্তু তারও দুর্ভাগ্য, সেই কীর্তির কোনো মূল্যায়ন হয়নি। প্রকাশ যখন অল ইংল্যান্ড জিতলেন, পরে আরও কয়েকটি মাস্টার্স টুর্নামেন্ট— তারপরই বদলে গেল এদেশের ব্যাডমিন্টন চালচিত্রটি। সমাজের একটা বড়ো অংশ খেলাটির প্রতি আসক্ত হলেন। সারা দেশে বেশ কিছু অ্যাকাডেমি গড়ে উঠল, বেড়ে গেল র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টের সংখ্যা। আর বহির্বিশ্ব সম্ভ্রম নিয়ে দেখা শুরু করল। প্রকাশের ২০/২২ বছর পর গোপীচাঁদ অল ইংল্যান্ড জিতে বিশ্ববৃত্তে স্থায়ী আসন গড়ে দিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। খেলা ছাড়ার পর গোপীচাঁদ হায়দরবাদের এক বড়ো মাপের শিল্পপতির সহায়তায় অসাধারণ অ্যাকাডেমি গড়ে



ভবিষ্যতের সাফল্যমণ্ডিত পথ পরিক্রমার দিকচিহ্ন রচনা করেন।

**□ বস্তুত এই অ্যাকাডেমিই যাবতীয় সাফল্যের স্টেপিং স্টোন।**

**দীপু ঘোষ :** একশো শতাংশ সত্যি। দেশের ফেডারেশন সর্বতোভাবে সহায়তা করছে যদিও, কিন্তু একক উদ্যোগে গোপী যে বিপ্লব সংগঠিত করেছে তার জন্য তাকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়া উচিত সরকারের। আজ গোপীর অ্যাকাডেমি থেকে একের পর এক বিশ্বমানের খেলোয়াড় বেরিয়ে আসছে। সাইনা নেওয়াল, পিভি সিন্ধু, কিদাম্বি শ্রীকান্ত, এইচ এস প্রণয়, সাইপ্রনীত এই পাঁচজন বিশ্বমানের খেলোয়াড়। বহু টুর্নামেন্টের খেতাব এদের হাত ধরে ভারতে এসেছে। আসি গ্রেট অজি কোচ হ্যারি হফম্যানের টেনিস অ্যাকাডেমি দেখে এসেছি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে। সেই অ্যাকাডেমির অনুকরণে গোপীর অ্যাকাডেমি গড়ে উঠেছে। একেবারে আধুনিকতম ও উন্নত প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর মিশেল। আর গোপীচাঁদ সহ অন্যান্য কোচ, টেনার, ফিজিও সবাই নিবেদিত প্রাণ। তাদের রয়েছে উন্নত ভিশন ও টেকনিকাল দক্ষতা। তাইতো একের পর এক 'চাম্পিয়ন প্রডাক্ট' বেরিয়ে আসছে। এই ব্যাপারটা শিল্পক্ষেত্রে কার্যকর করা গেলে জিডিপিও বেড়ে যাবে।

**□ সিন্ধু কোন কোন জায়গায় অনন্য বলে মনে হয়?**

**দীপু ঘোষ :** সিন্ধুকে বাসেলে যে ফার্মে খেলতে দেখলাম তাতে আমি মুগ্ধ বললেও কম বলা হয়। আমি বিস্ফারিত নেত্রে সিন্ধুকে শুধু দেখে গেছি। 'ফ্যাবুলাস'। 'ফিজিক্যাল ফিটনেস' ও 'মেন্টাল টাফনেস' কোন স্তরে নিয়ে গেছে। কোনো ম্যাচে বিন্দুমাত্র চাপ অনুভব করেনি, এতটাই 'কম্যান্ডিং' ছিল গোটা আসরে। ম্যাচ চলাকালীন আগের মতো চিৎকার করেনি। শান্ত, স্থিতধী থেকে পরের পর ম্যাচে বাঘা বাঘা প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর বুলডোজার চালিয়ে নির্মমভাবে জমি ধরিয়ে দিয়েছে। এই আত্মপ্রত্যয়ী ভাবটাই সিন্ধুর মধ্যে নতুন সংযোজন। যা ওকে পরের সব টুর্নামেন্টে বড়ো বড়ো সব শিখরে পৌঁছে দেবে।

**□ তাহলে কী মনে হচ্ছে আশিতে এসেও জীবন কত সুন্দর?**

**দীপু ঘোষ :** অবশ্যই, নিজেকে অশীতিপর মনে করি না। এই ৮০-তে এসেও আইসল্যান্ডের বাড়ির সংলগ্ন কোর্টে নেমে পড়ি। মাঝে-মধ্যে 'স্পেশাল টিপস' দিয়ে আসি জাতীয় খেলোয়াড়দের। ওই দেশে আমাকে মাথায় তুলে রেখেছে ফেডারেশন ও খেলোয়াড় থেকে কোচ সবাই। চমৎকার সুশৃঙ্খল, অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরা দেশ আইসল্যান্ড। নিজের ব্যাডমিন্টন খেলার জীবনে বহু দেশ ঘুরেছি। কিন্তু আইসল্যান্ডে এসে মনে হয়েছে সত্যিই বরফের মতো স্নিগ্ধ-শীতল আবহ। তবে সুদূর প্রবাসে থাকলেও দেশের সব বড়ো ঘটনার খোঁজ রাখি। ■

# জলসংকটে সারা বিশ্বের জীবনসংকট

**ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জলই প্রথম সৃষ্ট হয়। যখন জল বয়ে চলে, তখন অস্তিত্বময় সকল কিছুই উৎপন্ন হয়।

জল ব্যতীত জীবন সম্ভব হতে পারে না, তাই জীবনের এই প্রধান রসধারা সম্বন্ধে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ একটা নির্দিষ্ট টারগেট ঠিক করা সত্ত্বেও ২৫০০ কোটি মানুষ এখনও প্রাথমিক শৌচালয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এদের অর্ধেকই আছে ভারত ও চীনে। পরিশ্রুত জল আগের থেকে বহুলাংশে মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়েছে এ কথা ঠিক, এ ব্যাপারে মানব সমাজ এগিয়েও যাচ্ছে অবশ্যই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও বহু মানুষ পরিশ্রুত জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, পেটের অসুখে অসুস্থ হয়ে বহু শিশু অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এইসব কারণেই Global Interfaith WASH Alliance এগিয়ে এসেছে। বাংলায় বললে সারা বিশ্বের আন্তঃধর্মবিশ্বাসীদের জল, শৌচালয় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংগঠন বা মিত্র বন্ধন।' ২০১৩ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে WASH হল, Water, Sanitation and Hygiene। ইউনিসেফ সেপ্টেম্বর মাসে GIWA সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী প্রতিনিধিদের একত্র করেছে। একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই প্রয়াসের পিছনে কাজ করেছে সেটি হলো সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য পরিশ্রুত জল, শৌচালয়ের সুবিধা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে কার্যকরী করা। মানুষকে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। বহু মানুষ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয়, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই আন্তঃধর্ম সংগঠনে হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে 'গঙ্গা অ্যাকশন পরিবার'। এই পরিবেশ-বান্ধব পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন



ঋষিকেশের পরমার্থ নিকেতন আশ্রমের প্রধান স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী। 'গঙ্গা অ্যাকশন পরিবার' গঙ্গা নদীতে যে প্রচুর পরিমাণে দূষিত বর্জ্য বয়ে চলেছে, তার পরিমাণ কমাবার চেষ্টা করে চলেছে।

স্বামী চিদানন্দজী (মুনিজী) জানিয়েছেন যে ভারতে তাঁদের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের ভয়ানক বন্যা হয়ে যাওয়ার পরে আন্তঃধর্ম মৈত্রীবন্ধন লক্ষ্য করেছিল যে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অথবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে কেবলমাত্র পরিস্রুত জলের অভাবে। তাদের কর্মীরা কাজে নেমে পড়েছিল, তারা জল শোধনের ট্যাবলেট ও ফিলটার বণ্টন করেছে, মানুষকে শুদ্ধ জলপানের উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করেছে। অবশ্যই পানীয়জল যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কর্মীরা সেই কাজটিও করে চলেছে। মুনিজী আরও জানান যে তাঁর কর্মীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়েও কাজ করছে, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধোওয়ার গুরুত্ব কতখানি, তা বোঝাচ্ছে। খাদ্য গ্রহণের আগে হাত ধুয়ে নেওয়া বহু রোগকে ঠেকাতে পারে, এটা ছোটদের বোঝানো হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিবেশবান্ধব শৌচালয় তৈরির কাজও তারা করে চলেছে। এই ধরনের শৌচালয়ে বিভিন্ন পরিবার এবং ভ্রমণার্থীদেরও প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা তারা করছে। এইভাবে আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হবে, স্বাস্থ্য ও জীবন সুরক্ষিত থাকবে, সেই সঙ্গে নারীর মর্যাদাও অক্ষুন্ন থাকবে।

Community–Led Total Sanitation বা সমাজ পরিচালিত সম্পূর্ণ শৌচ ব্যবস্থা (CLTS) এই প্রকল্পের মূল নীতি। ২০০০ সালে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এরা প্রথম কাজ শুরু করে। এখন পঞ্চাশটি দেশে এরা কাজ করে চলেছে। প্রকৃত অগ্রগতির জন্য CLTS মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস পরিবর্তনের উপর জোর দেয়। তারা চেষ্টা করছে যাতে গ্রামবাসীরা খেত-খামারে, মাঠে-ঘাটে প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করে। এই কাজে যাতে সাফল্য লাভ করা যায়, সেই চেষ্টাই তাঁরা করে চলেছেন।

মুনিজী বলেছেন কীভাবে সমগ্র বিশ্বের ধর্মগুরুরা মানব সমাজে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে ধর্মবিশ্বাস থেকেই সামাজিক নিয়ম কানুনের উৎপত্তি। মুনিজী বলেছেন যে, চিরকাল মানুষ সুখে-দুঃখে আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে ছুটে গেছে, জীবনের পরম অর্থ খুঁজতেও তাঁদের কাছেই গেছে। লোকশিক্ষার কাজটি ধর্মগুরুরাই করেন, তাঁরাই মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগান। তাই পানীয় জলের গুরুত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব আধ্যাত্মিক গুরুর দ্বারাই সমাজে প্রচারিত হয়। তাঁদের কথা মানুষ ভক্তি সহকারে শোনে এবং মেনে চলে। সে কারণেই মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য নীরোগ জীবনের জন্য পরিশুদ্ধ জলের যে অসীম প্রয়োজনীয়তা, তা এই আন্তঃধর্ম সংগঠনের প্রতিনিধিরাই মানুষকে উপলব্ধি করাচ্ছেন। চিদানন্দ সরস্বতী যাকে সকলে মুনিজী বলে জানে, তিনি এ কথাই জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থিত জল ক্রমশ কমে আসছে। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে, জলের অপচয় আমরা করব না। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটিও করে যেতে হবে, যেখানে জলের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ■

# জনসমর্থন পুনরুদ্ধারে তৃণমূলের সাম্প্রতিক উদ্যোগ

# সাফল্য আদৌ মিলবে কি?

**বিমলশঙ্কর নন্দ**

গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা বলে। তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে জনগণ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজনৈতিক দলগুলিকে জনগণের দ্বারে উপস্থিত হতে হয় সমর্থনের আশায়। আবার নির্বাচনে জয়ী হবার পর সরকার পরিচালনার পর্যায়েও জনগণকে উপেক্ষা করা যায় না। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে জনমতকে উপেক্ষা করা আত্মহত্যার শামিল। জনগণের বৈধ দাবিদাওয়াগুলিকে বা মতামতগুলিকে ক্রমান্বয়ে উপেক্ষা করতে থাকলে নির্বাচনের সময় জনগণ তার প্রতিশোধ নেবেই। বিগত শতাব্দীর ৭০-এর দশকের শুরুতেই ভারত-পাক যুদ্ধ, পাকিস্তানকে টুকরো করে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়— তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সেই সময়ের নিরিখে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেত্রীর আসনে বসালেও ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয়। শুধু তাই নয়, ইন্দিরা গান্ধী নিজেও পরাজিত হন। কারণ রাজনৈতিক সাফল্যে বলীয়ান হয়ে ইন্দিরা গান্ধী ধরেই নিয়েছিলেন তিনি যা করবেন জনগণ তাতেই সমর্থন করবে। ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা, অধিকাংশ বিরোধী নেতাদের জেলবন্দি করা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ এক কথায় ভারতের সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়ে এক স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিষ্ঠা মানুষ গ্রহণ করেনি। এর জবাব ১৯৭৭-এর নির্বাচনে মানুষ দিয়েছিল। প্রথমত উল্লেখযোগ্য বিগত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে এদেশে প্রথম পে-কমিশন চালু হয়। ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ভাবনা তখন স্বপ্ন ছিল। জরুরি অবস্থা জারির পর এদেশে সংবাদপত্রের উপরও কঠোর সেনসরশিপ জারি করা হয়। শুধুমাত্র দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই দেশের মানুষকে একজোট করে দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে।

এদেশের রাজনীতিতে এমন উদাহরণ আরও অনেক। এর সাম্প্রতিক কালের উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আছে।



২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে ২৩৩টি আসন লাভ করার পর রাজ্যের তৎকালীন প্রধান শাসকদল সিপিআই (এম)-এর মনে হয়েছিল মানুষ এদের যা খুশি তাই করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে। 'আমরা ২৩০ ওরা ৩০', 'কেন শুনব ওদের কথা'— এই দম্ভে সিপিএম সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে জোর করে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে বেসরকারি মালিকদের দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় শিল্পস্থাপনের জন্য। সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে জমিজমা অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। মানুষ জমি দিতে রাজি না হলে বিকল্প স্থানে জমির বন্দোবস্ত করার দরকার ছিল। তার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সরকারি সন্ত্রাস নামিয়ে আনার প্রয়োজন ছিল না। চীনে শিল্পস্থাপনের জন্য জমির প্রয়োজন হলে একটি সরকারি নির্দেশনামাই যথেষ্ট। জনগণকে জমি খালি করে দিতেই হয়। প্রতিবাদ প্রতিরোধের কোনো জায়গাই নেই, চীনপ্রেমী সিপিএম ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্যের পর ভুলেই গিয়েছিল যে চীনের মডেল পশ্চিমবঙ্গে চালানো অসম্ভব। ভারতীয় গণতন্ত্র কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখানে সরকারি সন্ত্রাসকে মানুষ ভালো চোখে দেখে না। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বৈরাচারের জবাব মানুষ দিয়েছিল ভোটের মাধ্যমে। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৭৬টি আসন লাভ করা সিপিএম মাত্র ৪০টি আসন লাভ করেছিল। দলের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার ছিল 'আমরা ২৩০ ওরা ৩০'-এর

ফঃ ৬

প্রবক্তা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরাজয় যাদবপুর কেন্দ্র থেকে। এক সময়কার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটই কেবল পর্যুদস্ত হয়নি, তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী সূর্যকান্ত মিশ্র পরাজিত হয়েছিলেন নারায়ণগড় কেন্দ্র থেকে। ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোটের ফলে বোঝা গিয়েছিল সিপিএম-এর স্বৈরাচারী শাসন এবং সমাজের সর্বস্তরে উপস্থিত হয়ে মানুষের জীবন ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ মানুষ আর ফিরিয়ে আনতে চাইছে না।

জনগণ ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্কটি আবার আলোচনায় এসেছে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর। '৪২-৪২'-স্লোগানের প্রবক্তা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২২টি লোকসভা আসান। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ৩ শতাংশ ভোট কমেছে রাজ্যের শাসক দলের। এছাড়া অধিকাংশ বিরোধী দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক কিংবা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন ভোটে ব্যাপক হিংসা, অশান্তি না হলে, বিরোধী দলগুলি সমস্ত বুথে এজেন্ট বসাতে পারলে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আসন এবং ভোট দুই-ই কমতো। উপরন্তু যে-কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই জনগণের নির্বাচনী আচরণের একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে। একটি দল যখন সমর্থন হারাতে থাকে তখন শাসক দলকে ভোট দেন, কিন্তু তেমন কট্টর সমর্থক নন এই ধরনের মানুষরা মুখ ঘোরাতে শুরু করেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশের মোট ভোটারের অল্প সংখ্যক মানুষ দলের কর্মী কিংবা কট্টর সমর্থক হন। সাধারণভাবে এই সংখ্যাটা ১০ শতাংশের বেশি হয় না। বাকিরা ভোট দেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে। একটি দল যখন জনসর্থন হারাতে থাকে তখন এই মানুষরা অন্য দলের দিকে তাঁদের সমর্থন সরিয়ে নেন। এ কারণেও গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। হাজার চেষ্টা করেও এই সমর্থন ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। ২০০৬ থেকে ২০০৮ এই সময়কালে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সরকারি সন্ত্রাস নামিয়ে আনা যে মারাত্মক ভুল হয়েছিল তা মানুষের পাল্টা প্রতিরোধ এবং জমি রক্ষার জন্য মরণপণ লড়াই দেখে রাজ্যের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী বিশেষত প্রধান শাসকদল সিপিএম বুঝতে পেরেছে। রাজ্য শাসনের শেষ দু'বছর মানুষের সমর্থন ফেরত পেতে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জনসমর্থন ফেরত আসেনি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে জনগণের সঙ্গে দলের সম্পর্ক নতুন করে খতিয়ে দেখতে বাধ্য করছে। যেসব বিষয়ে রাজ্যের শাসক দলের প্রতি মানুষের ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি সেখানে কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হচ্ছে। যেমন সাধারণভাবে জনগণের রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ সংখ্যালঘু তোষণের। তার পাল্টা হিসেবে এখন পুরোহিত ভাতা (ইমাম ভাতার বিকল্প), দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে অনুদান (গতবার ছিল দশ হাজার, এবার বেড়ে হয়েছে পঁচিশ হাজার) প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। শাসক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো বেআইনি অর্থ উপার্জন এবং সরকারি ক্ষমতাকে অর্থ উপার্জনের কাজে লাগানো। এর জন্য কৌশলে নিয়ে আসা হয়েছে কাটমানির বিরুদ্ধে জেহাদ এবং কাটমানি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ। এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাফল্যের একটা বড়ো হাতিয়ার তৃণমূল নেত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে গত আট বছরে জনগণের সঙ্গে তৈরি হওয়া দূরত্ব ঘোচানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। গত ২১ আগস্ট দিঘা সফরকালে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে নিজের হাতে চা বানাচ্ছেন, নিজে সফরসঙ্গীদের হাতে চা তুলে দিচ্ছেন, মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই 'আমি তোমাদেরই লোক'— এই ভাবমূর্তিকে ফিরিয়ে আনা। 'তোমরা আমার ওপর ভরসা রাখো'— মানুষের কাছে এই বার্তা দেওয়া। এই ভাবনারই ফসল 'দিদিকে বলো' কমসূচি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোনো রাজনৈতিক দলই চাইবে হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থন ফেরত পেতে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই প্রক্রিয়াগুলিতে আদৌ কোনো কাজ হবে কিনা। তৃণমূল কংগ্রেস কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দল নয়। এর কোনো সুনির্দিষ্ট মতাদর্শও নেই। দলটি গঠিত হয়েছিল সিপিএম-কে ক্ষমতা থেকে সরাতে, সে কাজে সফল হওয়ার পর সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে দলকে একটি দৃঢ় সংগঠনে পরিণত করা যেত। তৃণমূল কংগ্রেস সে কাজে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তার সাফল্যের জন্য সংগঠন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তির ভাবমূর্তি একটি নির্মাণ, কোনো চিরসত্য বিষয় নয়। ব্যক্তি কীভাবে তাঁর ভাবমূর্তিকে ধরে রাখছেন কিংবা নির্মাণ করছেন তার উপর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। শাসকদল যতই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে ততই অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিরোধী নেতা-কর্মীদের উপর হামলা কমেনি। শক্তি দিয়েই জয় পাওয়া যাবে এই ভাব থেকে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা এখনো সরে আসেনি। কাটমানি নিয়ে চর্চা হিতে বিপরীত হতে চলেছে। কারণ বিভিন্ন স্তরেই শাসকদলের নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। একজন নেতা বা নেত্রীর 'কারিশ্মা' বা গণমোহিনী শক্তি দিয়ে যাকে দূর করা কার্যত অসম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে চায় যখন বিকল্প তৈরি হয়। ২০১১-তে বামফ্রন্টের বিকল্প ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ২০১৯-এর নির্বাচনে এ রাজ্যে প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে (১৮টি লোকসভা আসন এবং ৪০ শতাংশ ভোট) উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কেন্দ্রীয় সরকারেও অধিষ্ঠিত নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা-সহ। ভারতীয় জনতা পার্টি এক আদর্শভিত্তিক সংগঠিত দল। রাজ্যে তাদের প্রভাব বাড়ছে দ্রুত। তাই তৃণমূলের কাজটা কঠিন, অত্যন্ত কঠিন।

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূবর্তন জেলা সভাপতি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দীক্ষিত ভক্তিপদ পাল গত ১১ আগস্ট বাঁকুড়া শহরে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৬ পুত্র, ৬ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র ও নাতি সবাই স্বয়ংসেবক।



তিনি বাঁকুড়া পৌরসভায় ছ'বার পৌর কমিশনার নির্বাচিত হন। এর মধ্যে একবার তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। টাউন কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। এছাড়া গোরক্ষা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন আন্দোলন, স্বর্ণশিল্পীদের স্বার্থরক্ষা আন্দোলন, অন্নপূর্ণ ব্যায়াম সমিতি, অনুশীলন সমিতি, গন্ধেশ্বরী নদী বাঁচাও সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বহু মানুষ বাড়িতে এসে তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ, স্বস্তিকা পত্রিকার এক সময়ের প্রচার প্রতিনিধি, ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অদ্বৈতনাথ দে গত ১৪ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও দুই পুত্র রেখে গিয়েছেন। গত ২০ আগস্ট স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য মিলিত হন। লায়ন্স ক্লাবের সদস্য নরেশ দারুকা উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, লায়ন্স ক্লাবেব উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রয়াত শ্রী দে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।



* * *

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, জ্ঞানতপস্বী, একনিষ্ঠ জৈনী, বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের প্রান্তীয় সমিতির অন্যতম পূর্বতন সদস্য মহাবীর চাঁদ কাঁকারিয়া গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি সহধর্মিণী-সহ অগণিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।



১৯৪৩ সালে রাজস্থানের নাগোর জেলার গোগলাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসাসূত্রে বঙ্গপ্রদেশে আসেন। ১৯৯০ সালে রায়গঞ্জে তিনি স্বয়ংসেবক হন। ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বহু গুণের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে জনকল্যাণে ও সারস্বত সাধনায় ভারতমায়ের চরণে জীবন সমর্পণ করেন। সদা হাস্যময়, উৎসাহী, স্পষ্টভাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠার জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। জনজাতি সমাজের সেবার্থে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজে সক্রিয় ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রেরণায় সারদা সেবা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। তিনি সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে উত্তর দিনাজপুর জেলা শিশুমন্দিরের কাজকে সুদৃঢ় করেন।

* * *

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের স্বয়ংসেবক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ ব্যবস্থা প্রমুখ কল্যাণ সাহার মাতৃদেবী চিন্ময়ী সাহা গত ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি সদালাপী ও পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বহু প্রচারক তাঁর মাতৃচ্ছায়ায় স্নেহধন্য হয়েছেন। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রীগুরুজী, সুদর্শনজী ও রজ্জুভাইয়ার সেবা করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।



* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা প্রচারক পরিতোষ দে'র পিতৃদেব গত ৩০ জুলাই বীরভূম জেলার বাবুইজোড় গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।



# চীনে দুর্গাপূজার ডাক পেয়েছেন রাজগঞ্জের বিশ্বজিৎ ঝা

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** চীনেও বাঙ্গালিরা বসবাস করে। ধুমধাম করে দুর্গা পূজাও করে। সেরকমই একটি পূজার পৌরোহিত্য করার ডাক পেয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সুভাষপল্লীর স্বয়ংসেবক বিশ্বজিৎ ঝা। চীনের রাজধানী বেজিং শহরের বাঙ্গালি সংস্থা 'বেজিং বংস্' বহু বছর ধরেই দুর্গাপূজা করে। তাদের ডাকেই বিশ্বজিৎবাবু আগামী ১৭ অক্টোবর রওনা হবেন বেজিঙের উদ্দেশে।



বাবার সঙ্গে বিশ্বজিৎ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক সময়ের কার্যকর্তা বিশিষ্ট শিক্ষক বিনয়ভূষণ ঝার বড়ো পুত্র বিশ্বজিৎ ঝা শিশুকাল থেকেই স্বয়ংসেবক। বর্তমানে তিনি দেশের প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে দিল্লিতে কর্মরত। সেই সঙ্গে ভুটানে একটি কলেজের অতিথি অধ্যাপক। স্ত্রী ও এক পুত্র-সহ তিনি দিল্লিতেই থাকেন।

পেশাদারির পুরোহিত না হয়েও বিশ্বজিৎবাবু শুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে দুর্গাপূজা করতে পারেন। তিনি জানান, তাঁদের রাজগঞ্জের বাড়িতে প্রতি বছর তাঁর শিক্ষক পিতা দুর্গাপূজা করেন। ছোটোবেলা থেকে পূজার মন্ত্র শুনতে শুনতে পুরো মন্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ। সেই সঙ্গে পূজার সমস্ত বিধিনিয়মও রপ্ত করেছেন তিনি। বেজিং বংস্-এর সদস্য শুভম পাল তাঁকে ফেনে জানিয়েছেন, অন্য পেশায় সম্মানজনক উচ্চপদে থাকা কাউকে পুরোহিত হিসেবে তাঁরা খুঁজছিলেন। বিশেষ সূত্রে বিশ্বজিৎবাবুর কথা জেনেছেন। তাদের পূজার জন্য কলকাতার কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা তৈরি হয়ে আসছে।

বিশ্বজিৎবাবু ইতিমধ্যে তাঁর বাবার কাছে পূজার মন্ত্র ও বিধিনিয়ম ঝালিয়ে নিতে শুরু করেছেন। বললেন, বিদেশে বাঙ্গালি সংস্কৃতি তুলে ধরতে ও নতুন প্রজন্মকে শুদ্ধ উচ্চারণে পূজা করার প্রেরণা দিতেই তাঁর বিদেশে পূজা করতে যাওয়া।

# আয়কর দাখিলে সর্বকালীন রেকর্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বৈদ্যুতিন উপায়ে (ই-ফাইলিং) আয়কর দাখিলের সংখ্যা গত ৩১ আগস্ট একদিনেই সর্বকালীন রেকর্ড ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১২১-এ পৌঁছে আয়কর বিভাগে ইতিহাস তৈরি হয়েছে। একদিনে অনলাইনে আয়কর দাখিলের এই বিপুল সংখ্যা বিশ্বে সম্ভবত ইতিহাস গড়ল। সোশ্যাল মিডিয়ায় করদাতাদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ ও ই-ফাইলিং সংক্রান্ত প্রশ্নের দ্রুত জবাব দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের (সিবিডিটি) পক্ষ থেকে রবিবার বৈদ্যুতিন উপায়ে আয়কর দাখিলের যে খতিয়ান প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এই সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কর বিভাগের পক্ষ থেকে রিটার্ন দাখিল করার জন্য যে সহজ ও ব্যবহার-বান্ধব ব্যবস্থা চালু করা হয়, ফলে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হয়। একইসঙ্গে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে করদাতাদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখার ফলে রিটার্ন দাখিল আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে গত ৩১ আগস্ট প্রতি সেকেন্ডে রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ১৯৬, প্রতি মিনিটে দাখিলের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৪৭ এবং প্রতি ঘণ্টায় দাখিলের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৭১। গত ৩১ আগস্ট রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থাকায় আয়কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের পরিষেবা বিঘ্ন করার ২০৫টি অপপ্রয়াস ইনফরমেশন সিকিউরিটি টিম প্রতিহত করেছে।

## বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত ১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি ভক্তিপদ পাল লোকান্তরিত হওয়ায় ২৭ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি– সূর্যরতন গণ, সাধারণ সম্পাদক- সুশান্ত নন্দী। যুগ্ম সম্পাদক–হরসুন্দর দত্ত, কোষাধ্যক্ষ– বলরাম সরকার নির্বাচিত হয়েছেন।

# গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : প্রকাশ জাভড়েকর

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, কর্মসম্পাদন, সংস্কার ও রূপান্তর— এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই নতুন ভারত গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রী জাভড়েকর আজ কোচিতে মালয়ালা মনোরমা কোম্পানি আয়োজিত নিউজ কনক্লেভে 'নতুন ভারত : সরকার ও গণমাধ্যম' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রী জাভড়েকর বলেন, দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, জাতপাত ভেদাভেদমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ মুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত— এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখেই সরকার 'নতুন ভারত' গড়ার পরিকল্পনা করেছে। ''আমাদের দেশ বিবিধতাপূর্ণ। ভারতে আত্মার মধ্যেই বিবিধতা প্রোথিত রায়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো



বাঁচুন এবং বাঁচতে দিন'' বলেও শ্রী জাভড়েকর অভিমত প্রকাশ করেন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপারে সরকারের অপরিবর্তনীয় মনোভাবের কথা পুনরায় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের জন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংবাদমাধ্যমগুলিকে এটি উপলব্ধি করতে হবে যে এক গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজে স্বাধীনতার অর্থ হলো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা দিয়ে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নিজস্ব পন্থা-পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েই স্বাধীনতা বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গণপ্রহারের ঘটনা সম্পর্কে শ্রী জাভড়েকর বলেন, দেশে এ ধরনের যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার পিছনে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছড়ানো বিভিন্ন গুজব। সোশ্যাল মিডিয়ায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্বনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার অভাবের কারণেই গুজব ছড়াচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে গণপ্রহারের ঘটনা ঘটে চলেছে।

# জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই : রাজনাথ সিংহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে তারা বিরত থাকুক। লাদাখের লেহ-তে বৃহস্পতিবার ডিফেন্স ইনস্টিটিউট অব হাই অল্টিটিউড রিসার্চ আয়োজিত ২৬তম লাদাখি কিষাণ জওয়ান বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে কৃষক, নিরাপত্তা কর্মী ও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ''আমি পাকিস্তানের কাছে জানতে চাই, কাশ্মীর কখন আপনাদের অংশ ছিল? কাশ্মীর চিরকালই ভারতের অঙ্গ।'' তিনি আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারিতে সংসদে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়।

শ্রী সিংহ বলেন, পাকিস্তান অনৈতিকভাবে গিলগিট-বাল্টিস্তান- সহ পাক অধিকৃত কাশ্মীর



দখল করে রেখেছে। কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করার পরিবর্তে গিলগিট-বাল্টিস্তান অঞ্চলের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘটনাগুলি ঘটছে, সে ব্যাপারে নজর দিক। লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার কেবল এই অঞ্চলের মানুষের ভাবানুভূতিকেই সম্মান জানাননি, সেইসঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যই হলো দেশের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির সমাধানসূত্র স্থানীয়ভাবেই খুঁজে বের করা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এর আগে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিষাণ জওয়ান বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে লাদাখ স্বশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী কাউন্সেলর জামাইয়াং সেরিং নামগিয়েল, ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান ড. সতীশ রেড্ডি-সহ লাদাখে মোতায়েন পদস্থ সেনা আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডিফেন্স ইন্সটিটিউট অব হাই অল্টিটিউড রিসার্চ-এর পরীক্ষাগার ঘুরে দেখেন। এখানে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের ফলমূল ও শাকসবজি প্রদর্শিত রয়েছে। লাদাখের এই মেলা প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ কৃষক, সেনাকর্মী ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। লাদাখ অঞ্চলে সেনাকর্মী ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ওই প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, লাদাখের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের মেলা আয়োজন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

# রাষ্ট্রপতির জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ও জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২০১৯-এর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এবং ২০১৯-র জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু উপস্থিত ছিলেন। ২০১৯-এর রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরস্কার পেয়েছেন প্যারা- অ্যাথলিট মিস দীপা মালিক। দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ব্যাডমিন্টনে বিমল কুমার এবং টেবিল টেনিসে সন্দীপ গুপ্তকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে জীবনব্যাপী অবদানের জন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন— হকিতে মের্জাবান প্যাটেল, কাবাডিতে রামবীর সিংহ খোখার, ক্রিকেটে সঞ্জয় ভরদ্বাজ।

এ বছর বিশিষ্ট অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন— এস ভাস্করন (দেহসৌষ্ঠব), মিস সোনিয়া লাথের (বক্সিং), চিংলেনসানা সিংহ কাঙ্গুজাম (হকি), অজয় ঠাকুর (কাবাডি), গৌরব সিংহ গিল (মোটর স্পোর্টস), প্রমোদ ভগত (প্যারা-স্পোর্টস-ব্যাডমিন্টন), গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু (ফুটবল), মিস পুনম যাদব (ক্রিকেট), মিস স্বপ্না বর্মন (অ্যাথলেটিক্স), ভামিদিপতি সাই প্রণীত (ব্যাডমিন্টন) প্রমুখ। রাষ্ট্রপতি পাঁচজন বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্বকে ২০১৯-এর ধ্যানচাঁদ পুরস্কারে সম্মানিত করেন। এঁরা হলেন— ম্যানুয়েল ফ্রেডরিক্স (হকি), অরূপ বসাক (টেবিল টেনিস), মনোজ কুমার (কুস্তি), নীতেন কীর্তানে (টেনিস) এবং শ্রী সি লালরেম সাঙ্গা (তীরন্দাজি)।

এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি ছ'জনকে ২০১৮-র তেনজিং নারগে জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে জীবনব্যাপী বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়াংচুক শেরপাকে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। গগন নারাং স্পোর্টস প্রোমোশন ফাউন্ডেশন, গো স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে তরুণ প্রতিভা খুঁজে বার করা এবং তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় খেল প্রত্যুৎসাহ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

উন্নয়নের জন্য ক্রীড়ার ভূমিকার প্রসারে রায়ালসীমা ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টকেও খেল প্রত্যুৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।



# কাজানে বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় ভারতের ১৯টি পদক জয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বিশ্ব মঞ্চে ভারতের নাম ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাশিয়ার কাজানে আয়োজিত বিশ্ব দক্ষতা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন তুলে ধরেছে। ৪৮ সদস্যের ভারতীয় দল এবার একটি সোনা, একটি রুপো ও দুটি তামা-সহ ১৫টি পদক জয় করেছে। কাজানে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। এই ঐতিহাসিক সাফল্যে ভারতীয় দল সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছে এবং দক্ষতা ক্ষেত্রে বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছে। ২০১৭ সালে আবুধাবিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১১টি পদক জিতে ১৯তম স্থানে ছিল ভারত। সেখান থেকে এবার ৬ ধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছে দেশ। এই প্রতিযোগিতায় ওড়িশার এস অশ্বত্থা নারায়ণ জল প্রযুক্তি বিভাগে ১১টি দেশের প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে সোনা জিতেছে। কর্ণাটকের প্রণব নতুলাপাতি ওয়েব প্রযুক্তিতে ৩৩টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে রুপো পদক জিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সঞ্জয় প্রামাণিক অলংকার ক্ষেত্রে ১৬টি দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে লড়াই করে তাম্র পদক জয় করেছে। মহারাষ্ট্রের রতনপুরা গ্রাফিক্স ডিজাইনিং তামা পদক জিতেছে। অসামান্য এই সাফল্যের জন্য ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ দপ্তরের মন্ত্রী ড. মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। তিনি বলেছেন, এই সাফল্য প্রত্যেক ভারতীয়দের কাছে গর্বের। এই সাফল্য অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীদিনে দেশের যুবরা এই প্রতিযোগিতায় আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

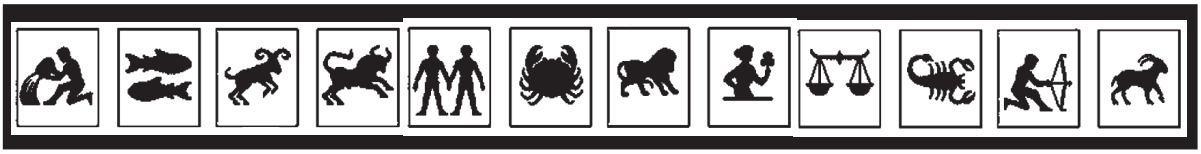

**৯ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি, তুলায় শুক্র, বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, মকরে মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে রোহিণী নক্ষত্র থেকে সিংহে মঘা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদদের ভাগ্যোদয় ও বিলাসী জীবন, শিল্পানুরাগীদের প্রেম-প্রীতি ও সৃজনশীলতায় স্বাচ্ছন্দ্য। ভ্রাতা-ভগ্নীর মেধার বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। বিদ্যার্থী ও সন্তান- সন্ততির জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি। মিত্র সমাগমে নিকট ভ্রমণ।

**বৃষ :** মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির যোগ। আর্থিক শুভ বিলাস- ব্যসনে ব্যয় যোগ। যুবক-যুবতীর অশুভ দৃষ্টি শান্ত ও সংযতভাবে মোকাবিলা করুন। কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। ভালো বন্ধু ভালো কাজের সহায়ক। হঠাৎ দূরদেশে ভ্রমণ। পিতা-পুত্রের সুকৃতি-সম্ভ্রম। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

**মিথুন :** জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উৎকর্ষ, উৎফুল্লতায় ভরা মন। জগতের কর্মযজ্ঞে প্রতিভার পূর্ণ মূল্যায়ন ও মান্যতা, অগ্রজ ও চাকুরেদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বিরোধিতা ও শরীরের কারণে উদ্বেগ। ক্যালকুলেটিভ আইডিয়ায় লিখিত কর্মে প্রসার ও শংসা।

**কর্কট :** গৃহের পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য হতাশার কারণ হবে। চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। কর্মপ্রাপ্তি ও পেশাদারদের আধিপত্য বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য, গুরুজনের সান্নিধ্যে সুপরামর্শ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

**সিংহ :** কোনো বন্ধুর পরামর্শ আর্থিক ক্ষতির কারণ। আয়ের একাধিক পথের সন্ধান। জমি-বাড়ির ক্রয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের জ্ঞানার্জনে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর যা গর্ব ও আনন্দ। প্রেম-প্রীতি- ভালবাসা ও স্বজন বাৎসল্যে সম্পৃক্ত মন। কৃষি ও কৃষকের প্রাপ্তি শুভ।

**কন্যা :** কর্মের যোগসূত্রে ভালো বন্ধুলাভ। প্রীতিকর, মেলবন্ধন, গৃহসুখ, উচ্চশিক্ষা অথবা কর্মসূত্রে স্থানান্তর, শৌখিন ও বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ। সমাজ- প্রগতিমূলক কর্মে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক।

**তুলা :** নিকটজনের মন্দ ব্যবহার মানসিক কষ্টের কারণ। পতি-পত্নী উভয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। রিপ্রেজেন্টেটিভ ও যানবাহন ব্যবসায় আর্থিক শুভ। নীতিগত বিষয়ে অনেকাংশে সমঝোতা করে চলতে হবে। গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কারে ব্যয়াধিক্য যোগ।

**বৃশ্চিক :** লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, আধিপত্য, মান্যতা ও আর্থিক শুভ। সন্তানের জ্ঞানার্জনে সাফল্য। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ও গুণীজনের সান্নিধ্য। সপ্তাহের প্রান্তভাগে উদার হৃদয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা। রমণীদের প্রতি দুর্বলতা ও মাথায় চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

**ধনু :** পড়াশুনায় চাপের কারণে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি। সততা, সরলতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, উদারতা, দৃঢ়তা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সম্পৃক্ত মন। সাহিত্য পিপাসু ও শিল্প রসিকদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও মান্যতা। খনিজ, যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় প্রাপ্তি শুভ।

**মকর :** ভ্রাতা, ভগ্নী ও প্রতিবেশীর নতুন কোনো খবর যা আনন্দ ও মর্যাদার। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন, মনকষ্ট। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। সন্তানের মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ।

**কুম্ভ :** গহনা-গ্রহরত্ন, খনিজ ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তি। গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও বিলাসব্যসনে আগ্রহ বৃদ্ধি। বেকারদের কর্মসংস্থানে প্রবাস। হস্তশিল্প, চর্মজাতদ্রব্যে অভিজ্ঞতার বাস্তব মূল্যায়ন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি।

**মীন :** পরিজন সান্নিধ্যে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে যোগদান। গুরুজনের পরামর্শ অর্থাগমের ক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করবে। আদর্শগত ব্যাপারে সমঝোতা করাই শ্রেয়। সপ্তাহের অন্তভাগে বিরোধিতা ও সমালোচনার ঝড় পীড়াদায়ক হবে।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

**—শ্রী আচার্য্য**

# স্বস্তিকা

## পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

**মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে**

*পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা*

### দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

### উপন্যাস

**শেখর সেনগুপ্ত** - চিহ্নায়ন ● **রন্তিদেব সেনগুপ্ত** - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
**প্রবাল চক্রবর্তী** - মহিষাসুর নির্ণাশী ● **জিষ্ণু বসু** - লিপা

### বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

### গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

### ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

### প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু, কল্যাণ চৌবে।

**আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা**